সিদ্ধার্থ ঘোষ

মজার খেলা অঙ্ক

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৭৮
দ্বিতীয় প্রকাশ
আগস্ট ১৯৭৮
তৃতীয় প্রকাশ
মার্চ ১৯৭৯

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬০০০০৬

স্কেচ :
অনাথবন্ধু মৈত্র

প্রচ্ছদ :
প্রণবেশ মাইতি
অশোক সেনগুপ্ত

দাম : [illegible] টাকা

MAJAR KHELA ANKA
By Sidhartha Ghosh
A book of mathematical games
and riddles for everyone.

● খুকুমণি মামনকে ●

বড়ো ঠাম্মি

সিদ্ধার্থ ঘোষের অন্য বই :

যুক্তি বুদ্ধি আই-কিউ

অঙ্ক আতঙ্ক নয়

নিয়ম ভেঙে অঙ্ক

কু-ঝিক-ঝিক রেলগাড়ি

অসম্ভবের গল্প

কি-কি আছে কোথায় আছে

* মজার খেলা অঙ্ক *

গোড়ার কথা : ৯ থেকে ১২

* দেশলাই কাঠির খেলা * ১৩ থেকে ২৮

	প্রশ্ন	উত্তর
ভুল শোধরাও :	১৩	২০
তিন থেকে চার :	১৩	২০
তিন আর দুয়ে আট :	১৪	২০
ভগ্নাংশের খেলা :	১৪	২১
দু ইঞ্চি লম্বা চোদ্দটা দেশলাই কাঠি জুড়ে এক গজ :	১৪	২১
দুর্গের পরিখা পার হওয়া :	১৪	২২
তীর থেকে ত্রিভুজ ও ত্রিভুজ থেকে চতুর্ভুজ :	১৫	২২
সাহেব বাড়ির খিলান :	১৫	২৩
ত্রিভুজের খেলা :	১৬	২৩
দেশলাই কাঠির বেড়া :	১৬	২৪
চৌকো ঘর, ত্রিভুজ আর তারা :	১৭	২৪
জমি ভাগ :	১৭	২৪
ক্ষেত্রফল চার :	১৮	২৫

* ক্যারাম ঘুঁটির খেলা * ২৯ থেকে ৪২

	প্রশ্ন	উত্তর
প্রথম খেলা :	২৯	৩৭
দ্বিতীয় খেলা :	২৯	৩৭
তৃতীয় খেলা :	৩০	৩৮
চতুর্থ খেলা :	৩০	৩৮
জোড়-বিজোড়ের খেলা :	৩১	৩৮
সাদা-কালর ওলট-পালট :	৩২	৩৯
শুধু একটি চাই :	৩৩	৪০
পিয়েট হাইনের খেলা :	৩৩	৪০
পিয়েট হাইনের আরো তিনটি খেলা :	৩৭	৪১

* কাগজ কাঁচির খেলা * ৪৩ থেকে ৫৫

	প্রশ্ন	উত্তর
সোজা লাইন ধরে কাঁচি চালাও :	৪৩	৪৯
স্থূলকোণী ত্রিভুজ কেটে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ :	৪৩	৪৯
তারা কেটে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ :	৪৪	৫০
ক্রশ চিহ্ন থেকে ত্রিভুজ :	৪৪	৫০
ছ'কোনা তারা থেকে বর্গক্ষেত্র :	৪৫	৫১
দ্বাদশবাহু বহুভুজ থেকে বর্গক্ষেত্র :	৪৫	৫১
বর্গক্ষেত্র থেকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ :	৪৬	৫২
ছবি কেটে বর্গক্ষেত্র :	৪৬	৫২
অষ্টভুজ থেকে আটকোনা তারা :	৪৬	৫৩
আয়তক্ষেত্র থেকে বর্গক্ষেত্র :	৪৭	৫৩
বিবিধ :	৪৭	৫৩
বিবিধ :	৪৭	৫৪
বিবিধ :	৪৭	৫৪

* বাইনারি সংখ্যার খেলা * ৫৬ থেকে ৮২

বাইনারি সংখ্যা কাকে বলে :	৫৬	৬৩
ম্যাজিক কার্ডের খেলা :	৬৪	৬৭
ভীতু কার্ডের খেলা :	৬৮	৭১
ব্রহ্মার মন্দির :	৭২	৭৬
খেলার নাম নিম :	৭৭	৭৯
খেলার নাম ট্যাক টিক্স :	৮০	৮২

* বুদ্ধি নিয়ে খেলা * ৮৩ থেকে ১০৪

সিঁড়ি ভাঙা শব্দের খেলা :	৮৩
নাপিতের বুদ্ধি :	৮৫
গোলপুকুরের তালগাছ রহস্য :	৮৬
ম্যানহোলের ঢাকনা :	৮৯
ঘড়ি মেলানর খেলা :	৯০
সত্যি-মিথ্যে খেলা :	৯৩
আমেরিকান আবোল-তাবোল :	৯৪
কথা বলার ছিরি :	৯৫
সংখ্যার ঘাড়ে ডাণ্ডা :	৯৬
অবিশ্বাস্য :	৯৭
সময় বিভ্রাট :	৯৯
সাধু আর স্বর্গের সিঁড়ি :	১০০
সাদা-সাদা, কাল-কাল, সাদা-কাল :	১০৩
হাঁটা আর গাড়ি চড়া :	১০৪

আর নেই

মজার খেলা অঙ্ক

অঙ্ক বেচারা এখন কোথাও আর ঠাঁই না পেয়ে ইস্কুলের বইয়ের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। আমরা জানি বার্ষিক পরীক্ষার সময়, বছরের মধ্যে ওই একবারই অঙ্ক-মহাশয়কে একটু খাতির-যত্ন করতে হয়। শুধু অঙ্ক কেন, ইতিহাস ভূগোলেরও একই দশা। অঙ্ক মানে যেমন-সংখ্যার হিজিবিজি, ইতিহাস তেমনি সাল তারিখের গোলক ধাঁধা, আর ভূগোলের সবটাই তো জল-জমির গোলমাল। পরীক্ষার দিনটার জন্তেই এইসব মুখস্ত করা প্রয়োজন। আসলে কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলের মতো অঙ্কও আমাদের জীবনে প্রতিদিন নানান রকমের কাজে লাগে। আমরা সেটা খেয়াল করি না, এই যা। অঙ্ক শেখার কি প্রয়োজন, না শিখলে কি কি অসুবিধে হতে পারে—এসব কথা কেউই বলে না। কেউ বলে না অঙ্ক কেবল এলোমেলো কতগুলো সংখ্যা নিয়ে পাগলের পাগলামি নয় বরং এলোমেলো ব্যাপারগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে অঙ্কই আমাদের সেগুলো বুঝতে সাহায্য করে। হঠাৎ দেখলে অনেক জিনিসই আমাদের খাপছাড়া

বলে মনে হয়, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে তা আর খাপছাড়া লাগে না। যেমন ধরো, এক এক রকম গাছের ডালে এক এক রকম ভাবে সাজান থাকে পাতাগুলো। কোথাও একটা ডালের দু'ধারে গজায় পাতার দুটো সারি আবার কোথাও পাতাগুলো ডালটার গায়ে এমন ভাবে গজায় যে দেখে মনে হয় যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে। কি অপূর্ব আর বৈচিত্র্যময় গাছের ডালে পাতার এই বিন্যাস। অথচ এই বৈচিত্র্যও কিন্তু প্রকৃতির একটা খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়। এর মধ্যেও একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা ধরা পড়েছে অঙ্কের হিসেবেই। অঙ্কের পণ্ডিতরা বলেন, গাছের পাতা ফিবোনাক্সি রাশি অনুযায়ী গজায়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বিশৃঙ্খল ব্যাপারগুলোকে সুন্দর করে একটা নিয়ম অনুযায়ী সাজাতে অঙ্কের কত প্রয়োজন। তাছাড়া অঙ্ক ব্যাপারটা মোটেই একঘেয়ে বা বিরক্তিকর নয়। অঙ্ক নিয়ে এমন খেলা জোড়া যায় যা সব খেলার আকর্ষণকে ম্লান করে দিতে পারে। যে কোন খেলার আকর্ষণ তার ফলাফলের অনিশ্চয়তা ঘিরে। মোহনবাগান জিতবে না ইস্টবেঙ্গল, আগে থেকেই সবাই যদি বলে দিতে পারে তাহলে কি আর ময়দানে অত ভিড় হবে? অঙ্কের অনেক খেলাই ঠিক এমনি অনিশ্চিত। তবে খেলতে খেলতে জেতবার কায়দাটা বা রহস্যভেদের কায়দাটা যারা বুদ্ধি খাটিয়ে বার করে ফেলতে পারবে তাদের আর হারান মুস্কিল। তখন অবশ্য খেলার মজাটা কমে যাবে। তাই বলছি, অঙ্কের যেসব খেলা এখানে দেওয়া হয়েছে, আগেই তার উত্তরগুলো দেখে নিও না। প্রথমে নিজেরা চেষ্টা করে দেখ, তারপর নেহাতই যদি সুবিধে না হয় পাতা উল্টে উত্তর দেখে নিও।

অঙ্ক কষার নাম শুনলেই লোকে ঘাবড়ে গিয়ে ভাবে এবার বুঝি বিরাট বিরাট গুণ-ভাগ করতে হবে। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। জ্যামিতির অনেক অঙ্কেই সংখ্যা নিয়ে হিসেব কষার কোন প্রয়োজন পড়ে না। দরকার হয় শুধু বুদ্ধি আর যুক্তির। শুধু

জ্যামিতিই নয়, এমন অনেক অঙ্কের সমস্যা আছে যার সমাধানের জন্যে শুধু বুদ্ধি খাটান প্রয়োজন। প্রথমেই সমস্যাটার দুর্বলতম জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে। তারপর সেই দুর্বল জায়গা থেকে শুরু করে বুঝে-সুঝে আর যুক্তির জোরে তাকে ধাপে ধাপে নাস্তানাবুদ করতে হবে ও শেষ পর্যন্ত একেবারে কুপোকাত করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে যদি একটা উদাহরণ দিই। ধর, তোমরা তিন বন্ধু বাইরে বেড়াতে এসে একদিন সকালে সবাই মিলে ঘুরতে বেরিয়েছ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা গাছতলায় শুয়ে তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়েছ। এমন সময় একটা দুষ্টু ছেলে যাচ্ছিল পাশের রাস্তা দিয়ে। তার হাতে ছিল এক শিশি কালি। তোমাদের ঘুমোতে দেখেই তার মাথায় চাপল দুষ্টু বুদ্ধি। তোমাদের প্রত্যেকের মুখে দিল কালি লেপে। ঘুম ভেঙে উঠে তোমরা প্রত্যেকেই দেখলে অন্য দু'জনের মুখ একেবারে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। সবাই শুরু করলে হাসতে। এমন সময় তোমার এক বন্ধু হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবতে বসল। তোমাদের মধ্যে ওই প্রথম বুঝতে পেরেছে যে তার নিজের মুখটাও কালি-লেপা। ও কি করে বুঝতে পারল বলতে পার কি ?

উত্তরটা খুবই সোজা। ধর, তোমাদের তিন বন্ধুর নাম—ক, খ আর গ। মনে কর, ক প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে তার নিজের মুখেও কালি মাখান আছে। তাহলে বলতে হবে ক নিশ্চয় ভেবেছিল—'খ যখন হাসছে তখন ও নিশ্চয় ভাবছে যে ওর মুখে কালি নেই। কিন্তু আমার মুখে যদি কালি না থাকত তাহলে গ-এর হাসি দেখে খ অবাক হত। কারণ আমার মুখও যদি খ-এর মুখের মতো পরিষ্কার হয় তাহলে গ হাসবে কেন ? খ কিন্তু দেখা যাচ্ছে অবাক হয়নি আর তার মানে হচ্ছে, খ ভাবছে যে গ আমার কালিমাখা মুখ দেখেই হাসছে।'

এই রকম যুক্তি খাটিয়ে চিন্তা করেছিল বলেই 'ক' বুঝতে

পেরেছিল যে তার গালেও কালি মাখান আছে।

এবার বিশ্বাস হল তো যে সংখ্যার ঝামেলা বাদ দিয়েও অঙ্ক হয়। এবার এক এক করে পাতা উল্টে যাও, দেখবে এই বিশ্বাস আরো পাকা হচ্ছে। তারপর একেবারে শেষকালে দেখবে সংখ্যাগুলো কোন ঝামেলা তো বাধাচ্ছেই না, উল্টে মজার মজার খেলা তৈরি করেছে।

দেশলাই কাঠির খেলা

এই খেলাগুলোর জন্যে শুধু এক বাক্স দেশলাই কাঠি লাগবে। প্রথমে নিজেরা চেষ্টা করে দেখবে কোন্‌টা কোন্‌টা নিজেরা করতে পারছ। একেবারে না পারলে ২০ পাতা থেকে ২৬ পাতার মধ্যে উত্তর দেওয়া আছে, পাতা উল্টে দেখে নিও।

(১) ভুল শোধরাও

বারোটা দেশলাই কাঠি দিয়ে নীচের সমীকরণটি লেখা হয়েছে। রোমান অক্ষরে লেখা এই সমীকরণটি সংখ্যায় লিখলে দাঁড়ায়—৬−৪=৯। মাত্র একটা দেশলাই কাঠির জায়গা বদল করে এই ভুল সমীকরণটাকে শুধরে দেওয়া যায়। দেখত পার কিনা।

ছবি ১

(২) তিন থেকে চার

টেবিলের ওপর তিনটে দেশলাই কাঠি রাখ। একটাও কাঠি না ভেঙে তিনটে কাঠিকে চারটে করে দিতে পার?

ছবি ২

(৩) তিন আর দু'য়ে আট

তিনটে কাঠি রাখ টেবিলের ওপর। এর সঙ্গে আর দুটো কাঠি জুড়ে আট পেতে পার কি ?

(৪) ভগ্নাংশের খেলা

সাতটা দেশলাই কাঠি দিয়ে $\frac{১}{৭}$ লিখে দেখান হয়েছে নীচে। একটাও কাঠি যোগ না দিয়ে বা না সরিয়ে $\frac{১}{৩}$ লিখতে পার ?

ছবি ৩
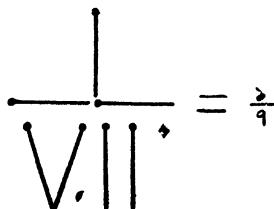
(৫) ২ ইঞ্চি লম্বা চোদ্দটা দেশলাই কাঠি জুড়ে এক গজ হতে পারে কি ?

(৬) দুর্গের পরিখা পার হওয়া

নীচের ছবির ভেতরে চৌকো ঘরটা একটা দুর্গ। দুর্গের চার ধারে আবার চৌকো পরিখা। পরিখার পাড় থেকে দুর্গ অবধি একটা সেতু তৈরি করতে পার কি দু'টো দেশলাই কাঠি দিয়ে ?

ছবি ৪
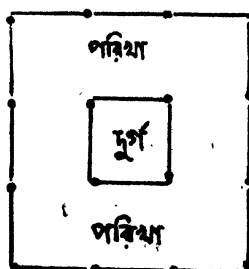
(৭) তীর থেকে ত্রিভুজ, ত্রিভুজ থেকে চতুর্ভুজ

ছবিতে দেখ ১৬টা কাঠি দিয়ে নীচের তীরটা তৈরি করা হয়েছে।
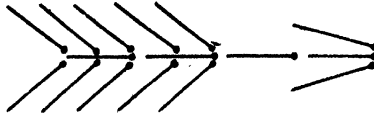
ছবি ৫

(ক) এর থেকে ৮টা কাঠি নেড়ে-চেড়ে ৮টা সমান আকারের ত্রিভুজ তৈরি কর।

(খ) এবার ৭টা কাঠি নাড়িয়ে ৫টা সমান আকারের চতুর্ভুজ তৈরি কর।

(৮) সাহেব বাড়ির খিলান

নীচে একটা সাহেব বাড়ির খিলান তৈরি করা হয়েছে দেশলাই কাঠি দিয়ে। (ক) এবার দুটো কাঠিকে সরিয়ে এমন ভাবে বসাতে পার কি যাতে ১১টা চৌকো ঘর তৈরি হয়? (২) চারটে কাঠিকে সরিয়ে এমন ভাবে বসাতে পার কি যাতে ১৫টা চৌকো ঘর তৈরি হয়?

ছবি ৬
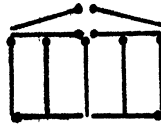
(৯) ত্রিভুজের খেলা

তিনটে দেশলাই কাঠি দিয়ে সমবাহু একটা ত্রিভুজ তৈরি করা তো খুবই সোজা। এবার ছবি দেখে ১২টা দেশলাই কাঠি দিয়ে ৬টা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি করে ফেল। এখন এই ৬টা সমবাহু ত্রিভুজ থেকে তিনটে সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি করতে পারবে কি? চারটের বেশী কাঠি নাড়াবে না কিন্তু।
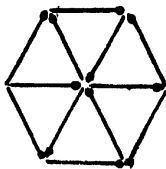
ছবি ৭

(১০) দেশলাই কাঠির বেড়া

২৬টা দেশলাই কাঠি দিয়ে নীচের বেড়াটা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টা কাঠিকে এমন ভাবে সরিয়ে বসাও যাতে তিনটে চৌকো ঘর তৈরি হয়।

ছবি ৮
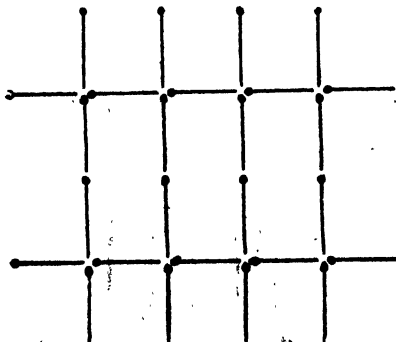
(১১) চৌকো ঘর ত্রিভুজ আর তারা

৮টা দেশলাই কাঠিকে এমন ভাবে সাজাও যাতে দু'টো চৌকো ঘর, ৮টা ত্রিভুজ আর একটা ৮ কোণা তারা তৈরি হয়।

(১২) জমি ভাগ

এক চাষীর ছিল একটা বাড়ি। আর বাড়ির চারদিকে বেড়া ঘেরা বাগান। নীচের ছবিতে চারটে দেশলাই কাঠি দিয়ে সেই বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে আর ষোলটা কাঠি দিয়ে বাগানের চারপাশে দেওয়া হয়েছে বেড়া।
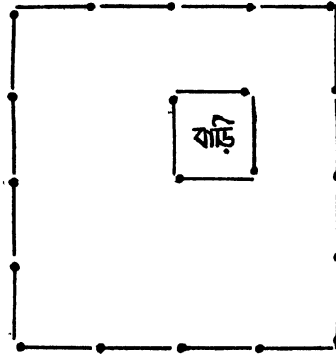
ছবি ৯

চাষীর পাঁচ ছেলে। বাগানটাকে তাই সে মরবার আগেই একই আকারের ও সমান মাপের পাঁচটা টুকরোয় ভাগ করে রেখে দিয়ে যেতে চায়। তোমাকে যদি দশটা দেশলাই কাঠি দেওয়া হয় তাহলে তুমি কি চাষীকে এই বাগান ভাগ করার কাজে সাহায্য করতে পারবে?

(১৩) ক্ষেত্রফল চার

হিসেবের সুবিধের জন্যে ধরা যাক প্রতিটি দেশলাই কাঠি ১ ইঞ্চি লম্বা। এখন বারোটি দেশলাই কাঠিকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন রকমের ক্ষেত্র তৈরি করা যায়, আর তার ক্ষেত্রফলও হয় বিভিন্ন। যেমন—

ছবি ১০

ক্ষেত্রফল $=$ ৩ $\times$ ৩ $=$ ৯ বর্গ ইঞ্চি
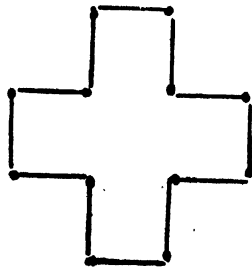
ছবি ১১

ক্ষেত্রফল $=$ ৫টি এক বর্গ ইঞ্চির চৌকো ঘরের সমষ্টি $=$ ৫ বর্গ ইঞ্চি
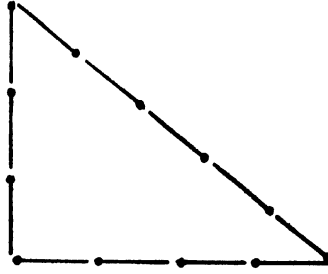
ছবি ১২

ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা $= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ বর্গ ইঞ্চি

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ, প্রতিটি ক্ষেত্র তৈরি করার সময়েই বারোটি দেশলাই কাঠির প্রত্যেকটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক এই ভাবে তোমরা ৪ বর্গ ইঞ্চি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক'টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পার চেষ্টা করে দেখতো।

দেশলাই কাঠির খেলার উত্তর

(১) দু'ভাবে ভুল শুধরে দেওয়া যায় —

(ক)

(খ)

ছবি ১৩

(২)

IV = ৪

ছবি ১৪

(৩)

VIII

ছবি ১৫

(৪) (ক)

= ২/৬ = ১/৩

ছবি ১৬

(খ)

= ৩/৯ = ১/৩

ছবি ১৭

(গ)

ছবি ১৮

(৫)
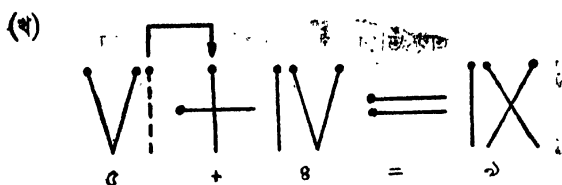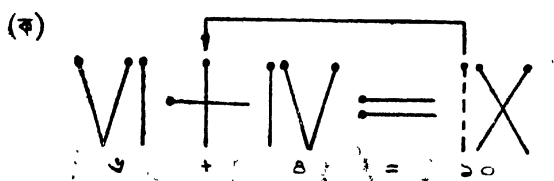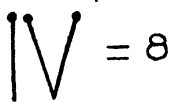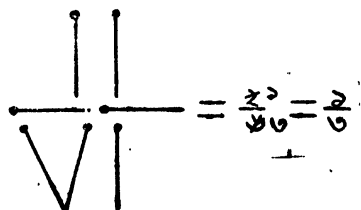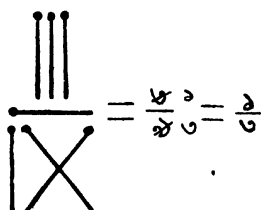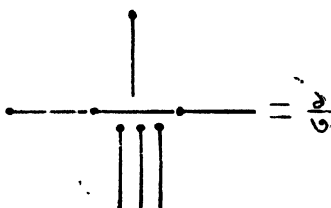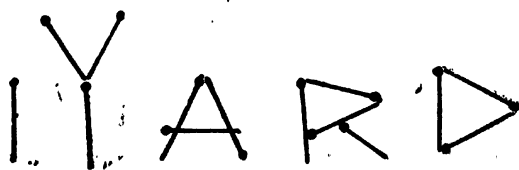
ছবি ১৯
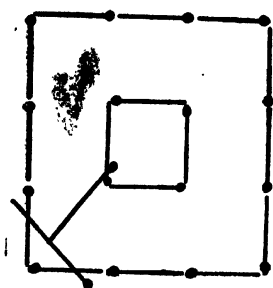
ছবি ২০
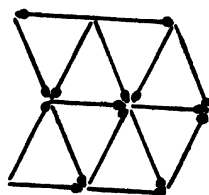
ছবি ২১
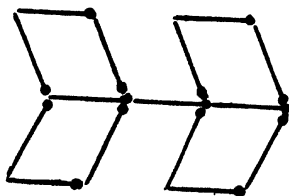
ছবি ২২

যে সাতটা কাঠি সরান হয়েছে তার শেষটাকে এবার ২২নং ছবির ওপর বা নীচের যে কোন একটা ফাঁকে বসিয়ে দাও।

(৮) (ক)
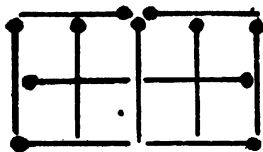
১১টা চৌকো ঘর

ছবি ২৩

চৌকো ঘরগুলো খুঁজে পাচ্ছ তো? একটার ভেতরে আরেকটা লুকিয়ে আছে কিন্তু। ৮টা ছোট-ছোট ঘর আছে আর ৩টে বড়।

(খ)
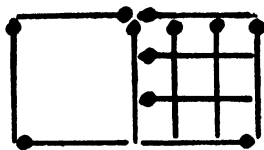
১৫টা চৌকো ঘর (৯টা ছোট, ৪টে মাঝারি ও ২টো বড়)

ছবি ২৪

(৯)

ছবি ২৫

ছবি ২৬

ছবি ২৭

ছবি ২৮
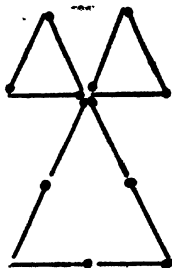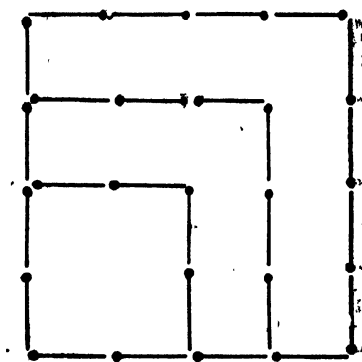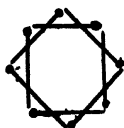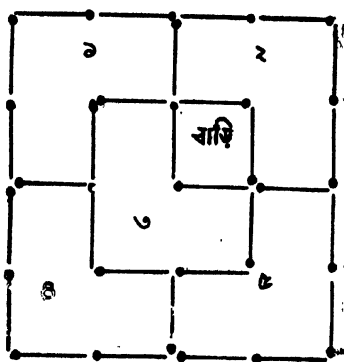
(১৩) (ক)
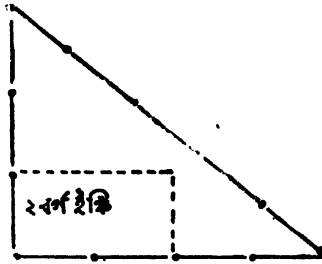
৬ বর্গ ইঞ্চি

ছবি ২৯
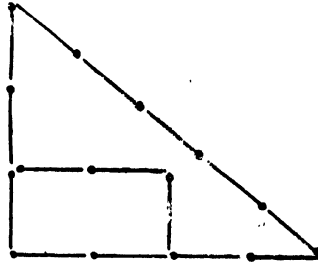
৪ বর্গ ইঞ্চি

ছবি ৩০

২ বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ত্রিভুজের থেকে বাদ চলে গেছে তাই এখন এই নতুন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দাঁড়িয়েছে ৪ বর্গ ইঞ্চি।

(খ) ৪ বর্গ ইঞ্চি বিশিষ্ট আরো বহু ধরনের ক্ষেত্র ১২টা দেশলাই কাঠি দিয়ে তৈরি করা সম্ভব। এটা তৈরি করার একটা কায়দা আছে। সেট হচ্ছে প্রথমেই চার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট যে-কোন একটা ক্ষেত্র তৈরি করে নেওয়া। এই রকম চারটি ক্ষেত্র নীচে তৈরি করে দেখান হয়েছে।

ছবি ৩১
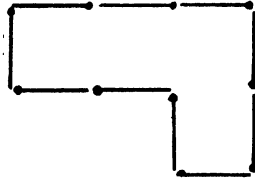
ছবি ৩২
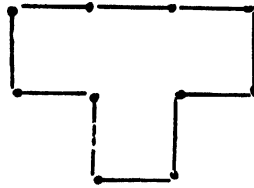
ছবি ৩৩
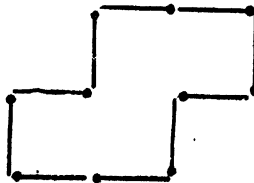
ছবি ৩৪

লক্ষ্য করে দেখ প্রতিটি ক্ষেত্র তৈরি করতে দশটি করে কাঠি

লেগেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র চারটি ছোট ছোট চৌকো ঘরের সমষ্টি, যার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল ১ বর্গ ইঞ্চি। এবার বাকী দুটি কাঠির সাহায্যে প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে একদিকে একটি ক্ষেত্র যোগ কর আর অন্যদিকে সমান মাপের একটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে দাও। তাহলেই ক্ষেত্রফল আগের মতো ৪ বর্গ ইঞ্চি থাকবে, অথচ ১২টি দেশলাই কাঠিও ব্যবহার করা হবে।

ছবি ৩৫
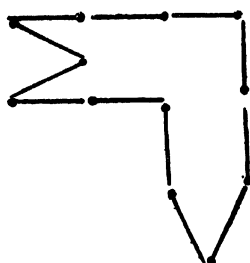
ছবি ৩৬
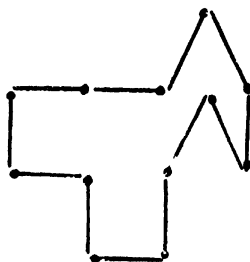
ছবি ৩৭
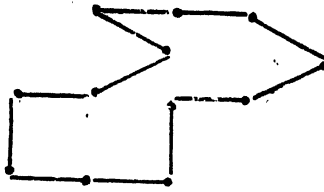
ছবি ৩৮

এ-ছাড়াও আরো অনেক রকম ভাবে দেশলাই কাঠি সাজানো যেতে পারে। চেষ্টা করলেই পারবে।

ক্যারাম ঘুঁটির খেলা

(এই খেলার জন্যে লাগবে কয়েকটা ক্যারামের ঘুঁটি আর কাগজ-পেন্সিল। এই নিয়েই খেলা যাবে। প্রশ্নের উত্তর পাবে ৩৭ পাতা থেকে ৪২ পাতার মধ্যে)

(১) প্রথম খেলা

একটা কাল আর একটা সাদা, এই ভাবে পর পর ছ'টা ক্যারামের ঘুঁটি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে বসান হয়েছে। ঘুঁটিগুলোর

ছবি ৩৯

বাঁ পাশে এরকম আরো চারটে ঘুঁটি বসানর মত জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। প্রত্যেক চালে পাশাপাশি দুটো করে ঘুঁটি এক সঙ্গে ধরে সরাতে পার কিন্তু অন্য ঘুঁটি নাড়ান চলবে না। মাত্র তিন বার চাল দিয়ে সব কটা সাদা ঘুঁটিকে একসঙ্গে বাঁদিকে নিয়ে আসতে হবে। কাল ঘুঁটিগুলো থাকবে সাদাগুলোর ডান দিকে।

(২) দ্বিতীয় খেলা

৪০নং ছবি দেখে ষোলটা ক্যারামের ঘুঁটিকে পাশাপাশি চার সারি আর ওপর নীচে চার সারিতে সাজাও।
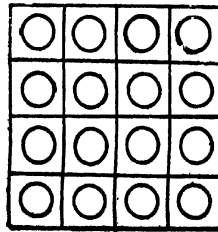
ছবি ৪০

এবার এর থেকে ছ'টা ঘুঁটি এমন ভাবে সরিয়ে নাও যাতে যে-কোন সারিতে জোড় সংখ্যার ঘুঁটি পড়ে থাকে।

(৩) তৃতীয় খেলা

চারটে সাদা আর চারটে কাল ঘুঁটি নাও। দশটা চৌকো ঘর কেটে ঘুঁটিগুলোকে পাশাপাশি এমন ভাবে বসাও যাতে সাদা, কাল, সাদা, কাল—এই ভাবে পর পর বসে।

এবার ফাঁকা ঘরের মধ্যে বসাবার জন্যে, পাশাপাশি যে-কোন ছুটো ঘুঁটিকে একসঙ্গে নিয়ে এক-একবার চাল্‌তে পার। মাত্র চারবার চেলে সব সাদা ঘুঁটিগুলো এক ধারে আর কালগুলোকে আরেক ধারে সরিয়ে ফেলতে পারবে কি?

(৪) চতুর্থ খেলা
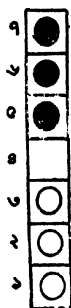
ছবি ৪১

ওপরের ছবি দেখে সাতটা খোপ কেটে ছ'টা ক্যারামের ঘুঁটি বসাও। তিনটি সাদা ঘুঁটি বসাও ১, ২ আর ৩ নম্বর ঘরে, আর কাল তিনটে বসাও ৫, ৬ আর ৭ নম্বর ঘরে। যে-কোন ঘুঁটিকে তার পাশের ফাঁকা ঘরটায় নিয়ে যেতে পার বা যে-কোন একটা

ঘুঁটিকে টপকে তার পাশের খালি ঘরে বসাতে পার। যেমন ৩নং ঘরের ঘুঁটিটাকে ৪নং ঘরে বসান যায় বা ২নং ঘরের ঘুঁটিটাকে ৩নং ঘরের ঘুঁটির মাথার ওপর দিয়ে ৪নং ঘরে আনা যায়। এবার দেখ তো, কম পক্ষে ক'বার ঘুঁটি চেলে কাল ঘুঁটিগুলোকে নীচের তিনটে ঘরে আর সাদা ঘুঁটিগুলোকে ওপরের তিনটে ঘরে বসাতে পার।

(৫) জোড় বিজোড়ের খেলা

চারটে কাল আর চারটে সাদা রঙের ক্যারামের ঘুঁটি নাও। এবার ছোট ছোট আটটা কাগজের টুকরোয় ১ থেকে ৮ অবধি সংখ্যাগুলো লিখে নাও। কাল ঘুঁটিগুলোর মাথায় এক এক করে
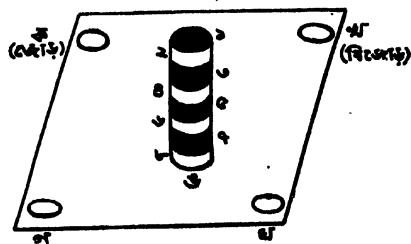
ছবি ৪২

গঁদ দিয়ে আটকে দাও ১, ৩, ৫ আর ৭—এই চারটে বিজোড় সংখ্যা। এবার সাদা ঘুঁটি চারটের মাথায় আটকে দাও—২, ৪, ৬ আর ৮—এই চারটে জোড় সংখ্যা। এবার একটা খাতার পাতা ছিঁড়ে তার মাঝখানে এই আটটা ঘুঁটিকে সংখ্যা অনুযায়ী পর পর ঙ-ঘরে সাজিয়ে বসাও। সবচেয়ে ওপরে থাকবে ১নং ঘুঁটিটা আর সবচেয়ে নীচে ৮নং-টা। এবার ছবিটা দেখে কাগজের চার কোণে ক্যারামের ঘুঁটির আকারে চারটে বৃত্ত টেনে নাও। ছবিতে দেখ এই চারটে বৃত্তর নাম দেওয়া হয়েছে ক, খ, গ আর ঘ। এবার কাল ঘুঁটিগুলোকে (বিজোড় সংখ্যা লেখা) ক-ঘরে সরাতে হবে আর সাদা ঘুঁটিগুলোকে সরাতে হবে (জোড়-সংখ্যা লেখা) খ-ঘরে। এক এক বারে একটা

করে টি সরিয়ে ক, খ, গ, ঘ বা ঙ ঘরে রাখতে পার। তবে ছোট সংখ্যা লেখা ঘুঁটির ওপর বড় সংখ্যা লেখা ঘুঁটি বসান যাবে না। যেমন ৭-এর ওপর ৮-কে বসান যাবে না, বা ৬-এর ওপর ৭ বা ৮-কে বসান যাবে না।

এবার নিজেরা খেলে দেখ তো, সবচেয়ে কম ঘুঁটি চেলে ক' বারে জোড় আর বিজোড় ঘুঁটিগুলোকে ক আর খ ঘরে পর পর নম্বর অনুযায়ী সাজাতে পার?

(৬) সাদা কালর ওলট পালট

নীচের ছবিটা দেখে একটা কাগজে ঠিক ওই রকম ভাবে খোপ কেটে নাও। খোপের মধ্যে ক্যারামের ঘুঁটি বসানর মতো জায়গা
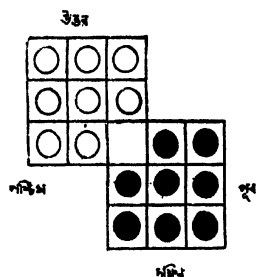
ছবি ৪৩

রাখবে। এবার আটটা সাদা আর আটটা কাল ক্যারামের ঘুঁটিকে ছবি অনুযায়ী সাজিয়ে নাও।

খেলাটা হচ্ছে জায়গা বদলের। সাদা ঘুঁটিগুলোকে কালর জায়গায় আর কালগুলোকে সাদার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। খেলার নিয়ম হচ্ছে, এক বারে শুধু একটা ঘুঁটিকে নাড়ান যাবে, তবে কোনাকুনি ভাবে নয়—পাশাপাশি বা ওপর নীচে। তবে ফাঁকা ঘর পেলে, একটা ঘুঁটির ওপর দিয়ে আরেকটা ঘুঁটি লাফিয়ে যেতে পারে।

সাদা কাল ঘুঁটিগুলোর জায়গা বদল করতে কমপক্ষে কতবার ঘুঁটি চালতে হবে বলতে পার কি? চেষ্টা করে দেখ তো।

(৭) শুধু একটি চাই

নীচের ছবিটার মতো ক'রে একটা কাগজে চৌকো চৌকো ঘর এঁকে তার মধ্যে কতকগুলো ঘর পেন্সিল ঘষে কাল করে দাও। তারপর ছবির মতো বাঁ-দিকের সারির নীচের ঘরের ঠিক ওপরটায় একটা কাল ক্যারামের ঘুঁটি বসাও। এবার আরো সাতটা ক্যারামের ঘুঁটি নাও। এই ঘুঁটিগুলোকে এমন ভাবে ওই চৌখুপীর সাদা ঘরগুলোয় বসাতে হবে যাতে পাশাপাশি, ওপর-নীচে বা কোণাকুণি—কোন সারিতেই একটার বেশী দু'টো ঘুঁটি না থাকে। পারবে কি?

ছবি ৪৪

(৮) পিয়েট হাইনের খেলা
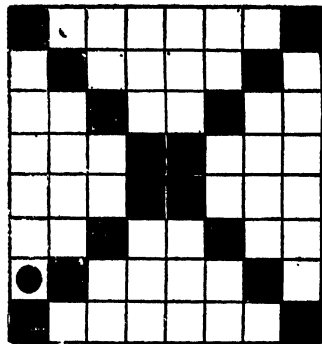
পিয়েট হাইনে ডেনমার্কের লোক। সবাই তাঁকে খুব ভালবাসত। তিনি ছিলেন পদার্থ বিদ্যার ছাত্র। কিন্তু কারিগরী বিদ্যায় ছিল তাঁর দারুণ মাথা। অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তিনি ছাত্রাবস্থাতেই। সেইজন্ত পদার্থবিদ্যা ছেড়ে

তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে শুরু করেন। এই সময় জার্মানীর নাজি দস্যুরা ডেনমার্ক আক্রমণ করে। সেটা ১৯৪০ সাল। হাইনে তখন নাজি বিরোধী সংগ্রামে উঠে পড়ে লাগেন। ছদ্মনামে অনেক লেখাও তিনি লিখেছিলেন। আর আত্মগোপন করে থাকার সময়ে আবিষ্কার করেছিলেন এই খেলাটি।

ছ'কোণা কতকগুলো ঘর জুড়ে তৈরি করা হয় এই খেলার বোর্ড। এই রকম তিনটে বোর্ডের ছবি ৪৫ (ক, খ, গ)।

ছবি ৪৫ (ক)
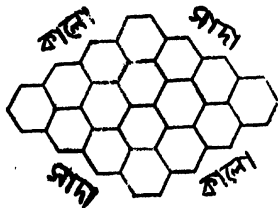
ছবি ৪৫ (খ)
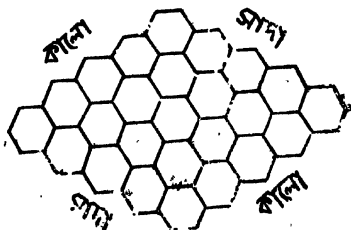
ছবি ৪৫ (গ)

দিয়ে দেওয়া হল। আর সেই সঙ্গে এঁকে দেওয়া হল একটা বড় ছ'কোণা ঘর (ছবি ৪৬)। তোমরা এই ঘরটার মাপে এক টুকরো
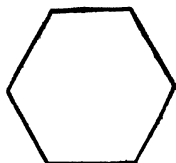
ছবি ৪৬

পিচবোর্ড কেটে তারপর সেই পিচবোর্ডটার ধার দিয়ে পেন্সিল বুলিয়ে কাগজের ওপর খেলার বোর্ড তৈরি করে নিতে পার। এই পিচবোর্ডের টুকরোটাকে ছবি অনুযায়ী সরিয়ে সরিয়ে বসিয়ে ছোট বা বড় যে কোন বোর্ড তৈরি করে নেওয়া যায়। এবার দেখ, ছবিতে আঁকা বোর্ডের ধারে ধারে লেখা রয়েছে সাদা, কাল, সাদা, কাল। যে-দু'জন মিলে খেলতে বসবে তাদের একজন নেবে ক্যারামের সাদা ঘুঁটি আরেক জন নেবে কাল ঘুঁটি। একবার এ চালবে, আরেকবার ও চালবে। প্রত্যেক চালে একটা করে ঘুঁটি বসাতে পারবে। যে কাল ঘুঁটি নিয়েছে সে চেষ্টা করবে একের পর এক কাল ঘুঁটি বসাতে, যাতে সে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বোর্ডের গায়ে 'কাল' বলে লেখা একটা ধার থেকে ঠিক উল্টো ধারে পেঁৗছতে পারে। মানে, এক 'কাল' ধার থেকে অন্য 'কাল' ধারে। যে সাদা ঘুঁটি নিয়েছে সেও একই চেষ্টা করবে। যে আগে তার ঘুঁটিগুলোকে এইভাবে মালার মতো সাজিয়ে এক দিক থেকে অন্যদিকে পেঁৗছতে পারবে তারই জিত। তবে বোর্ডের কোন ঘর একবার দখল হয়ে গেলে আর সেখানে ঘুঁটি বসান চলবে না। তাছাড়া একই রঙের দুটো ঘুঁটি পর পর বসান মানে গায়ে গায়ে লাগানো দু'টো ছ' কোণা ঘরে বসান। এবার তোমরা একটা করে বোর্ড তৈরি কর, আর খেলে দেখ কে জেতে। এই

খেলায় জেতবার কতকগুলো নিয়ম আছে। দেখত, তোমরা খেলতে খেলতেই খেলা-জেতার নিয়মগুলো বার করতে পার কিনা।

এই একই খেলা যদি আরো বড় বোর্ড তৈরি করে খেলা যায় তাহলে কিন্তু জেতার কোন সহজ নিয়ম শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এক এক ধারে এগারোটা করে ছ'কোণা ঘর নিয়ে খেলার বোর্ডটা তৈরি করা হয়।

(১) পিয়েট হাইনের আরো তিনটে খেলা

নীচে তিনটে খেলার বোর্ডের ছবি দেওয়া হয়েছে—ছবি ৪৭ (ক, খ ও গ)। প্রত্যেকটায় কয়েকটা করে ঘুঁটির চাল দেওয়া রয়েছে। এবার যদি সাদা ঘুঁটির চাল হয় তাহলে কোন্ বোর্ডের কোন্ ঘরে সাদা ঘুঁটি বসালে শেষ পর্যন্ত সাদা ঘুঁটির খেলোয়াড়ের জিত হবে?

ছবি ৪৭ (ক)

ছবি ৪৭ (খ)

ছবি ৪৭ (গ)

ক্যারাম ঘুঁটির খেলার উত্তর

(১)

				১●	২○	৩●	৪○	৫●	৬○
		২○	৩●	১●			৪○	৫●	৬○
		২○	৩●	১●	৪●	৬○	৫○		
৬○	৪○	২○	৩●	১●	৫●				
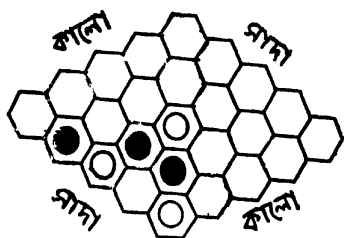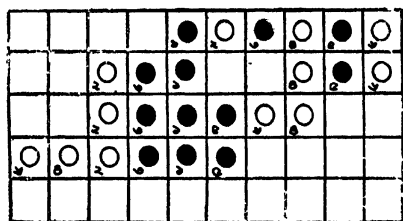
ছবি ৪৮

(২)

○	○		
○	○	○	○
	○	○	
	○		○
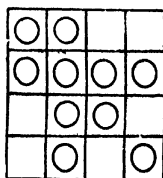
ছবি ৪৯

একটি উদাহরণ দেখান হল। আরো হতে পারে।

(৩)
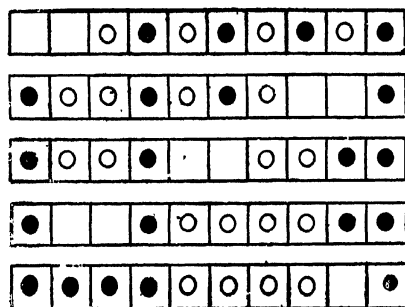
ছবি ৫০

(৪)
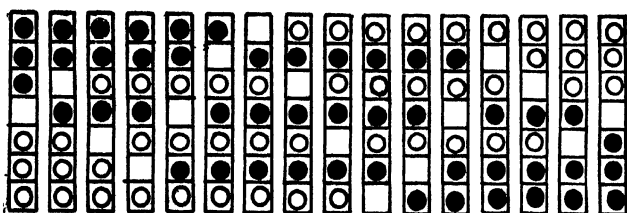
১৫টি চাল

ছবি ৫১

(৫) ২৪টা চাল লাগবেই। চালগুলো পর পর নীচে দেওয়া হল।

১। ১নং কে ক ঘরে	২। ২নং কে খ ঘরে
৩। ৩নং কে গ ঘরে	৪। ৪নং কে ঘ ঘরে
৫। ২নং কে ঘ ঘরে	৬। ৫নং কে খ ঘরে
৭। ৩নং কে খ ঘরে	৮। ১নং কে খ ঘরে
৯। ৬নং কে গ ঘরে	১০। ৭নং কে ক ঘরে
১১। ১নং কে ক ঘরে	১২। ৬নং কে ঙ ঘরে

১৩। ৩নং কে গ ঘরে ১৪। ১নং কে গ ঘরে
১৫। ৫নং কে ক ঘরে ১৬। ১নং কে খ ঘরে
১৭। ৩নং কে ক ঘরে ১৮। ১নং কে ক ঘরে
১৯। ৬নং কে গ ঘরে ২০। ৮নং কে খ ঘরে
২১। ৬নং কে খ করে ২২। ২নং কে গ (বা ঙ) ঘরে
২৩। ৪নং কে খ ঘরে ২৪। ২নং কে খ ঘরে

(৬) কম করে ৪৬টা চাল লাগবে। চালগুলো পর পর লিখে দেওয়া হল।

১। পুবে এক ঘর ২। পশ্চিমে এক লাফ
৩। পশ্চিমে এক ঘর ৪। পুবে এক লাফ
৫। উত্তরে এক ঘর ৬। দক্ষিণে এক লাফ
৭। দক্ষিণে এক ধাপ ৮। উত্তরে এক লাফ
৯। পুবে এক লাফ ১০। পশ্চিমে এক ধাপ
১১। পশ্চিমে এক লাফ ১২। দক্ষিণে এক ধাপ
১৩। পুবে এক ধাপ ১৪। পশ্চিমে এক লাফ
১৫। দক্ষিণে এক ধাপ ১৬। পুবে এক লাফ
১৭। দক্ষিণে এক ধাপ ১৮। দক্ষিণে এক লাফ
১৯। পুবে এক ধাপ ২০। উত্তরে এক ধাপ
২১। দক্ষিণে এক লাফ ২২। পশ্চিমে এক ধাপ
২৩। উত্তরে এক লাফ ২৪। উত্তরে এক লাফ
২৫। দক্ষিণে এক লাফ ২৬। দক্ষিণে এক লাফ
২৭। পুবে এক লাফ ২৮। উত্তরে এক ধাপ
২৯। দক্ষিণে এক লাফ ৩০। পশ্চিমে এক লাফ
৩১। উত্তরে এক লাফ ৩২। পুবে এক ধাপ
৩৩। পশ্চিমে এক লাফ ৩৪। উত্তরে এক লাফ
৩৫। পুবে এক ধাপ ৩৬। পশ্চিমে এক লাফ
৩৭। দক্ষিণে এক লাফ ৩৮। পুবে এক লাফ

৩৯।	পূবে এক লাফ	৪০।	পশ্চিমে এক ধাপ
৪১।	পশ্চিমে এক লাফ	৪২।	পূবে এক ধাপ
৪৩।	উত্তরে এক লাফ	৪৪।	দক্ষিণে এক ধাপ
৪৫।	দক্ষিণে এক লাফ	৪৬।	উত্তরে এক ধাপ

(৭)
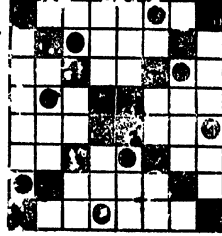
ছবি ৫২

(৮) 'ক' বোর্ডে যে প্রথম চাল দেবে ও মাঝের ঘরে দেবে সেই জিতবে।

ছবি ৫৩

'খ' বোর্ডের খেলায় প্রথম খেলোয়াড় সব সময়েই জিততে পারে যদি সে ১, ২, ৩ বা ৪ সংখ্যক ঘরে প্রথম চাল দেয়।
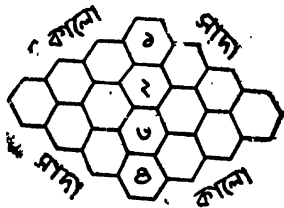
ছবি ৫৪

'গ' বোর্ডের খেলায়ও প্রথম খেলোয়াড়ই জিতবে যদি সে মাঝের ঘরে চাল দেয়। পরের চালগুলোও অবশ্য ভেবে দিতে হবে।
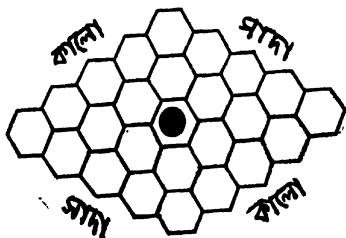
ছবি ৫৫

(৯) ক, খ ও গ বোর্ডে সাদা ঘুঁটির পরবর্তী চাল × চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে।

ছবি ৫৬
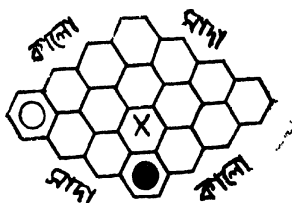
ছবি ৫৭
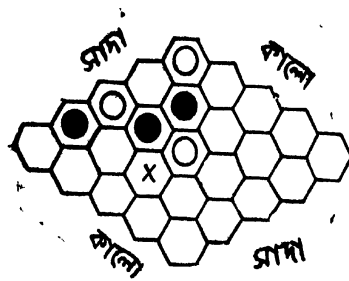
ছবি ৫৮

কাগজ কাঁচির খেলা

(১) সোজা লাইন ধরে কাঁচি চালাও

গোল করে কয়েকটা কাগজের টুকরো কেটে নাও। এবার সোজা লাইন বরাবর কাঁচি চালিয়ে একটা গোল টুকরোকে দু'ভাগ কর।

ছবি ৫৯

ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। কাঁচি দিয়ে একবার এইভাবে কেটে একটা বৃত্তকে যদি দু' টুকরো করা যায়, তিনবার কাঁচি চালিয়ে বৃত্তটা থেকে সবচেয়ে বেশী ক'টা টুকরো বার করা যাবে? চারবার কেটেই বা সবচেয়ে বেশী ক'টা টুকরো পাওয়া যেতে পারে?

(২) স্থূলকোণী ত্রিভুজ কেটে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ

একটা স্থূলকোণী ত্রিভুজকে (যার একটা কোণ নব্বই ডিগ্রির বেশী) এমন ভাবে কাটতে পার কি, যাতে কাটা অংশগুলো প্রত্যেকটা এক একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ (যার তিনটি কোণের প্রতিটিই নব্বই ডিগ্রির কম) হয়? সবচেয়ে কম করে কতবার কেটে সেটা সম্ভব হতে পারে?
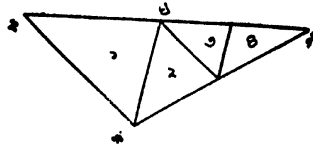
ছবি ৬০

৬০নং ছবিতে দেখ, একটা স্থূলকোণী ত্রিভুজ কখগ-কে (যার খ কোণটা স্থূলকোণ) কয়েকটা টুকরো করা হয়েছে। এর মধ্যে ১, ২ আর ৩ নম্বর টুকরো ক'টা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হয়েছে কিন্তু ৪ নম্বর টুকরোটা হয়ে গেছে স্থূলকোণী ত্রিভুজ। তোমরা এবার চেষ্টা কর।

(৩) তারা কেটে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ

৬১নং ছবিতে একটা পাঁচ কোণা তারা দেখা যাচ্ছে। কম করে এটাকে কত টুকরো করলে প্রত্যেকটা টুকরোই এক একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হবে? কিভাবে কাটবে সেটাও বলতে হবে কিন্তু।
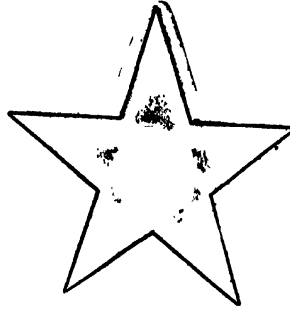
ছবি ৬১

(৪) ক্রশ চিহ্ন থেকে ত্রিভুজ

পরের পাতায় ৬২নং ছবিটা একটা ক্রশ চিহ্নের। এটাকে কম করে কটা টুকরো করলে প্রত্যেকটা টুকরো এক-একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হবে?
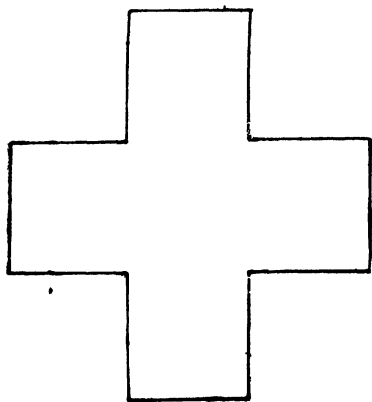
ছবি ৬২

(৫) ছ' কোণা তারা থেকে বর্গক্ষেত্র

নীচের ছ'কোণা তারাটাকে কম পক্ষে কটা টুকরো করলে সেই কাটা টুকরোগুলো জুড়ে একটা বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাবে ?
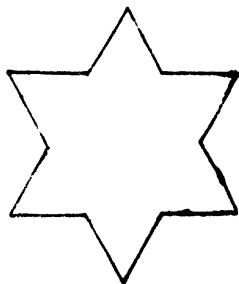
ছবি ৬৩

(৬) দ্বাদশবাহু বহুভুজ থেকে বর্গক্ষেত্র

পরের পাতার বহুভুজটাকে কম পক্ষে ক'টা টুকরো করলে সেই কাটা টুকরোগুলো জুড়ে একটা বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাবে ?
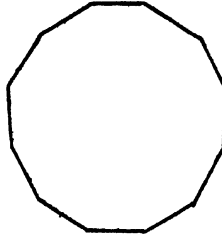
ছবি ৬৪

(৭) বর্গক্ষেত্র থেকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ

একটা বর্গক্ষেত্রকে কম পক্ষে ক'টা টুকরো করলে প্রত্যেকটা টুকরো এক একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হবে ?

(৮) ছবি কেটে বর্গক্ষেত্র

নীচের ছবিটাকে মাত্র চারবার সরলরেখা বরাবর কেটে এমন ভাবে সাতটা টুকরো করতে পার কি, যাতে এই টুকরো সাতটা জোড়া দিয়ে একটা বর্গক্ষেত্র পাওয়া যেতে পারে ?
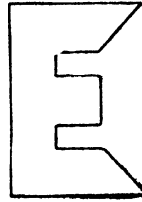
ছবি ৬৫

(৯) অষ্টভুজ থেকে আটকোণা তারা

পরের পাতায় ৬৬নং ছবির অষ্টভুজ ক্ষেত্রটার মাঝখানে রয়েছে একটা অষ্টভুজ বিশিষ্ট গর্ত। এই ছবিটাকে এবার এমন ভাবে আটটা টুকরো কর যাতে আটটা টুকরোই আকারে সমান হয় এবং টুকরো ক'টা জুড়লে একটা আটকোণা তারা তৈরি হয়। এই তারাটার মধ্যিখানে থাকবে আগের মতোই একটা অষ্টভুজ বিশিষ্ট গর্ত।

ছবি ৬৬

(১০) আয়তক্ষেত্র থেকে বর্গক্ষেত্র

১৬০ মি, মি দৈর্ঘ্য আর ৯০ মি, মি প্রস্থ বিশিষ্ট একটা আয়তক্ষেত্রকে এমন ভাবে দুটো টুকরো কর যাতে টুকরো দুটো জুড়লে ১২০ মি, মি বাহু বিশিষ্ট একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়।

(১১) নীচের ক্ষেত্রটিকে এমন ভাবে তিনটে টুকরো কর যাতে টুকরো কটা জুড়লে একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়।

ছবি ৬৭

(১২) নীচের ষড়ভুজটিকে এমন ভাবে ছ'টা টুকরো কর যাতে প্রতিটি টুকরো এক একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হয়।
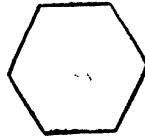
ছবি ৬৮

(১৩) পরের পাতায় তিনটি জিনিসের ছবি আঁকা রয়েছে। সরল

রেখা বরাবর এগুলোকে এমন ভাবে কাটতে হবে যাতে প্রত্যেকটা ছবির কাটা টুকরোগুলো জুড়লে এক একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়।
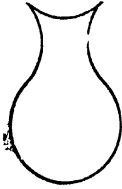
(ক) ছবি ৬৯ (খ) ছবি ৭০ (গ) ছবি ৭১
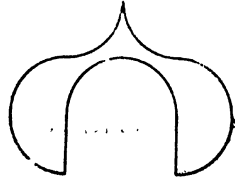
কাগজ কাঁচির খেলার উত্তর

(১) তিনবার সোজা লাইন বরাবর কেটে সাতটার বেশী টুকরো পাওয়া যায় না। আর চারবার এইভাবে কেটে এগারোটা টুকরো পাওয়া যেতে পারে।
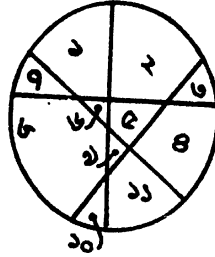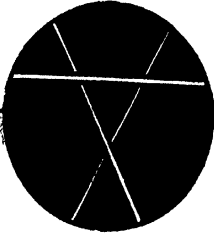
তিনবার কেটে সাত টুকরো

ছবি ৭২

চারবার কেটে এগারো টুকরো

ছবি ৭৩

একটা গাণিতিক সমীকরণ আছে যার সাহায্যে বলে দেওয়া যায় ক'বার কাটলে সবচেয়ে বেশী কত টুকরো পাওয়া সম্ভব। সমীকরণটি এই রকম—

টুকরোর সংখ্যা $= \frac{১}{২} \times ক^{২} + \frac{১}{২} \times ক + ১$, ক = কতবার কাটা হচ্ছে তার সংখ্যা

যেমন, চারবার কাটা হলে 'ক'-এর মূল্য তখন ৪, আর টুকরোর সংখ্যা $= \frac{১}{২} \times ৪^{২} + \frac{১}{২} \times ৪ + ১$

$= \frac{১}{২} \times ১৬ + ২ + ১ = ৮ + ২ + ১ = ১১$

(২) সাত টুকরোর কমে একটা স্থূলকোণী ত্রিভুজ কেটে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ তৈরি করা সম্ভব নয়। ৭৪নং ছবি দেখ।

ছবি ৭৪

(৩) কম করে ৬ টুকরো করতেই হবে।
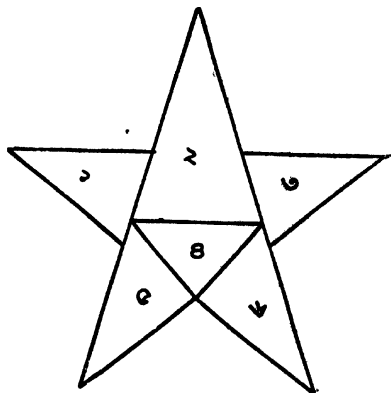
ছবি ৭৫

(৪) ২০ টুকরো
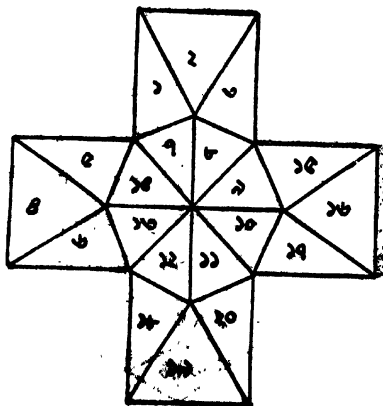
ছবি ৭৬

(৫) ৫ টুকরো
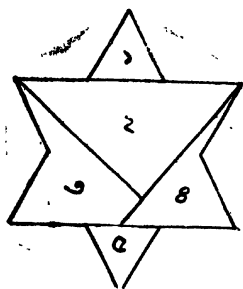
ছবি ৭৭
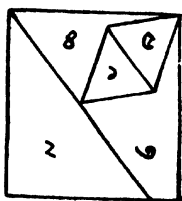
ছবি ৭৮

(৬) ৬ টুকরো
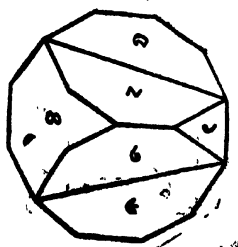
ছবি ৭৯
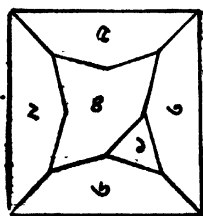
ছবি ৮০

(৭) আটটা টুকরো। য র ল ব একটি বর্গক্ষেত্র। য র বাহুকে ব্যাস করে একটি অর্ধ বৃত্ত টানো। ল ব বাহুকে ব্যাস করে আরেকটি অর্ধবৃত্ত টানো। য ব আর র ল বাহুর মধ্যবিন্দু ঙ ও গ বার কর। র গ আর গ ল-কে ব্যাস করে আরো দুটি অর্ধবৃত্ত টানো। এই
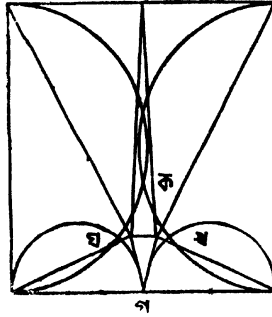
ছবি ৮১

চারটি অর্ধবৃত্তের মধ্যবর্তী ক খ গ ঘ স্থানে যে কোন দুটি বিন্দু নাও। এবার এই দুটো বিন্দু, গ, ঙ এবং বর্গক্ষেত্রের চারটি কোণকে সরলরেখা টেনে (ছবি অনুযায়ী) যুক্ত করলেই দেখা যাবে আটটি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ পাওয়া যাচ্ছে।

(৮)

ছবি ৮২ ছবি ৮৩

(৯)

(১০)
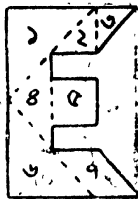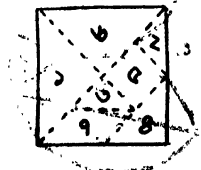
ছবি ৮৪ ছবি ৮৫
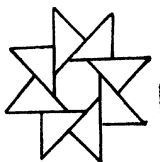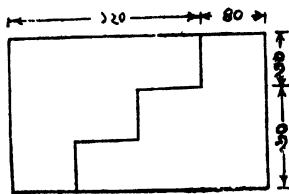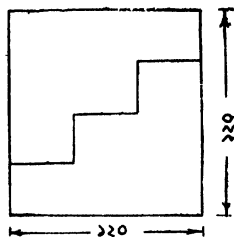
ছবি ৮৬ ছবি ৮৭

(১১) ৮৮নং ছবিতে খ ও গ যুক্ত করা হয়েছে। ক থেকে খ গ-র ওপর 'ক ঘ' লম্ব টানা হয়েছে। ঙ চ-কে ক ঘ-এর সমান করে কেটে নেওয়া হয়েছে। ছ চ এবং চ ও ক যুক্ত করা হতেই কাল রেখা বরাবর ক্ষেত্রটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে।
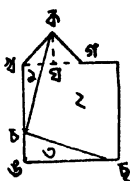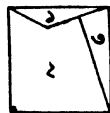
ছবি ৮৮ ছবি ৮৯

৮৯নং ছবিতে এই তিনটে টুকরো জুড়ে পাওয়া গেছে একটা বর্গক্ষেত্র।

(১২) ৯০(ক) ছবির ক ও গ বিন্দু যোগ কর। ক চ বাহুকে বাড়িয়ে ঙ থেকে তার ওপর ঙ ব লম্ব টানো। ঙ ব-র সমান করে ক ব থেকে য ব কেটে নাও। য আর ঙ যোগ কর। য ঙ-কে ব্যাসার্ধ করে, একবার য বিন্দুকে কেন্দ্র করে আর একবার ঙ বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুটি চাপ টানো। চাপ দুটি ছ' বিন্দুতে ছেদ করেছে।

ছবি ৯০(ক) ছবি ৯০(খ)

এবার ছ ও য আর ছ ও ঙ যোগ কর। ছ য ঙ একটি সমবাহু ত্রিভুজ যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 'অ'। এবার খ বিন্দু থেকে ক গ-এর ওপর লম্ব টানো খ জ। জ ও ছ বিন্দু যোগ করে ঝ অবধি বিস্তৃত করো। চিত্রটি এবার ৬টি টুকরোয় ভাগ হয়েছে (পুরু রেখাগুলি শুধু ধরতে হবে)।

৯০(খ) ছবিতে এই ছ'টি টুকরো জুড়ে '২অ' বাহু বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ পাওয়া গেছে।

১৩(ক)

ছবি ৯১ ছবি ৯২

(খ)
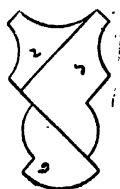
ছবি ৯৩
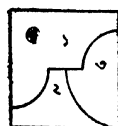
ছবি ৯৪

(গ)
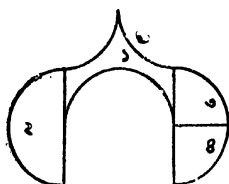
ছবি ৯৫
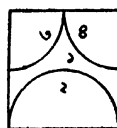
ছবি ৯৬

বাইনারি সংখ্যার খেলা

যে কোন সংখ্যা লিখতে হলে আমরা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ বা ৯—এই দশটা অঙ্কের সাহায্য নিই। এইগুলোকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসিয়ে যে-কোন সংখ্যা লেখা যায়। এই পদ্ধতিটা পৃথিবীর সব দেশের মানুষই ব্যবহার করে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই দশটা অঙ্কের পরিবর্তে মাত্র দু'টো অঙ্ক ব্যবহার করেই কিন্তু যে-কোন সংখ্যা লেখা যায়। এই অঙ্ক দুটো হচ্ছে ০ আর ১। ০ আর ১-এর বদলে শুধু 'না' আর 'হ্যাঁ' বসিয়েও যে-কোন সংখ্যা লেখা যায়। শুধু ০ আর ১ ব্যবহার করে সংখ্যা লিখলে তাকে বলা হয় বাইনারি সংখ্যা। প্রাচীন কালে চীন দেশের অঙ্কের পণ্ডিতরা এই পদ্ধতিতে অনেক অঙ্ক কষেছিলেন কিন্তু বাইনারি পদ্ধতি পুরোপুরি চালু হয় 'কম্পিউটার' মেশিন তৈরি হবার পরে।

'কম্পিউটার' বিদ্যুতে চলে এবং এই যন্ত্রে অনেক ধরনের অঙ্ক কষা যায়। কম্পিউটার কিন্তু শুধু বাইনারি পদ্ধতিতে অঙ্ক কষতে পারে। এর কারণটা বোঝাও তেমন শক্ত কিছু নয়। তোমাদের ঘরে যে ইলেকট্রিক বাল্ব আছে সেটা সুইচ টিপলে জ্বলে, আবার সুইচ বন্ধ করলে নিবে যায়। তার মানে আমি যদি প্রশ্ন করি, আলোটা জ্বলছে কি? তার উত্তর হতে পারে মাত্র দুটো—হ্যাঁ কিংবা না। এখন এই 'হ্যাঁ'-টাকে আমরা যদি ১ হিসেবে ধরি আর 'না'-টাকে ০ হিসেবে, তাহলেই ব্যাপারটা বাইনারি পদ্ধতিভুক্ত হয়ে পড়বে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পক্ষে তাই ০ আর ১ নিয়ে কাজ করা খুব সহজ।

এবার তোমাদের শিখিয়ে দিই সাধারণ সংখ্যাকে কিভাবে বাইনারি পদ্ধতিতে লেখা যায়। ধরো ৭, এই সংখ্যাটাকে তুমি বাইনারি পদ্ধতিতে শুধু ০ বা ১ ব্যবহার করে লিখবে। প্রথমে ৭-কে ২ দিয়ে ভাগ কর। তাহলে ভাগফল হল ৩ আর ভাগশেষ ১। এই ভাগশেষ ১টা হচ্ছে আমাদের বাইনারি সংখ্যার প্রথম অঙ্ক।

এবার ৭-কে ২ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফলটা পাওয়া গেছে, অর্থাৎ ৩-কে আবার ২ দিয়ে ভাগ কর। এবার ভাগফল পাওয়া গেল ১, আর ভাগশেষ ১। এই ভাগশেষ ১টা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক। আবার আগের ভাগফল ১-কে ২ দিয়ে ভাগ কর। ১-এর মধ্যে ২ যাচ্ছে না, তাই ভাগফল হচ্ছে ০, আর ভাগশেষ ১। এই ভাগশেষ ১টা বাইনারি সংখ্যার সর্বশেষ অঙ্ক। তাহলে ৭-এর বাইনারি রূপ হল ১১১।

যে কোন সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হলে এইভাবে তাকে বারবার ২ দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য হচ্ছে। প্রত্যেক বার ভাগ করার পর যে ভাগ-শেষগুলো থাকবে সেগুলোকে আলাদা করে একটার পিছনে আরেকটা বসিয়ে গেলেই বাইনারি সংখ্যাটা পাওয়া যাবে।

২) ৭ (৩
　 ৬
　 ১ — বাইনারি সংখ্যার প্রথম অঙ্ক ··· ১

২) ৩ (১
　 ২
　 ১ — বাইনারি সংখ্যার দুটি অঙ্ক ··· ১১

২) ১ (০
　 ০
　 ১ — বাইনারি:সংখ্যাটি ··· ১১১

এবারে আরেকটা উদাহরণ ধরা যাক। ৮-কে বাইনারি সংখ্যায় লিখতে হবে।

২) ৮ (৪
　 ৮
　 ০ — বাইনারি সংখ্যা ··· ০

২) ৪ (২
　 ৪
　 ০ — " " ··· ০০

২) ২ (১
　 ২
　 ০ — " " ··· ০০০

২) ১ (০
　 ০
　 ১ — " " ··· ১০০০

বারবার ভাগ করে বাইনারি সংখ্যা বার করার ঝামেলা একটু সহজ করে দিচ্ছি এবার। এই পদ্ধতিতে ১ থেকে ৩১ অবধি যে কোন সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত করা যাবে। নীচের ছবির মতো তোমার বাঁ হাতটা উল্টে ধর। এবার মনে কর,

ছবি ৯৭

কড়ে আঙুলটা হচ্ছে ১, তার পাশের আঙুলটা ২, তার পরেরটা ৪, তার পরেরটা ৮ আর বুড়ো আঙুলটা ১৬। সংখ্যাগুলো এইভাবে মনে রাখা যায়—

$$১ = ১^{0}$$

$$২ = ২^{১}$$

$$৪ = ২^{২}$$

$$৮ = ২^{৩}$$

$$১৬ = ২^{৪}$$

অর্থাৎ কড়ে আঙুলের এক থেকে শুরু করলে, পরের আঙুলের সংখ্যাগুলো প্রতি ধাপে দু' গুণ করে বেড়েছে। এবার ধরো ৭ সংখ্যাটাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হবে। ৭ থেকে বিয়োগ করা যায় এই রকম সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা আগে ঠিক করে নাও ওই পাঁচটা আঙুলের মধ্যে থেকে। বোঝা যাচ্ছে ৪টাই সবচেয়ে বড়। যে আঙুলটাকে ৪ হিসেবে ধরেছি, সেটাকে এবার মুড়ে ফেল। পাতা উল্টে ৯৮ নং ছবি দেখ।

৭ থেকে ৪ বাদ গেলে রইল তিন। আঙুল থেকে তিন পেতে হলে কড়ে আঙুল (১) আর তার পাশের আঙুল (২) এই দুটো আঙুলের সংখ্যাদুটো যোগ করতে হয়। তাই এবার কড়ে আঙুল আর তার পাশের আঙুলটাকেও মুড়ে ফেল। ৯৯নং ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।
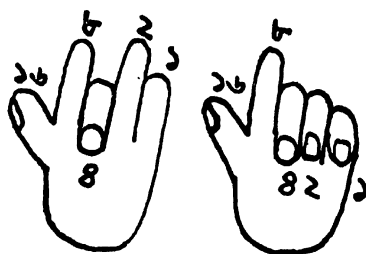
ছবি ৯৮ ছবি ৯৯

তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে আমরা এমন ভাবে তিনটে আঙুলকে মুড়েছি যাদের যোগফল হচ্ছে ৭। এইভাবে বিভিন্ন আঙুলের সংখ্যাগুলোকে যোগ করে ০ থেকে ৩১ অবধি যে কোন সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

এবার মনে কর, হাতের যে কোন আঙুল যখন খোলা থাকবে তখন তার বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে '০'। আর যে কোন আঙুল মোড়া থাকলে তার বাইনারি সংখ্যা হবে '১'। তার মানে পাঁচটা আঙুলই যখন মোড়া হবে তখন বাইনারি সংখ্যাটা দাঁড়াবে ১ ১ ১ ১ ১। ৭ সংখ্যাটার বাইনারি সংখ্যা বার করতে গিয়ে আমরা কড়ে আঙুল থেকে শুরু করে পরপর তিনটে আঙুল মুড়েছি। তাই বাইনারিতে ৭-কে লেখা হবে—০ ০ ১ ১ ১ হিসেবে। আগের শূন্যগুলোর কোন মূল্য নেই তাই শুধু ১ ১ ১ লিখলেই হবে। পাতা উল্টে ১০০নং ছবি দেখ।

৭ = ১১১
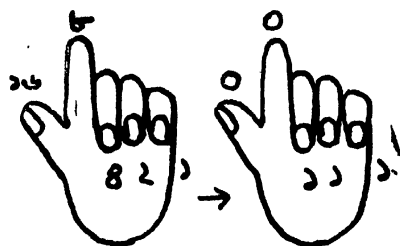
ছবি ১০০

এই ভাবে আঙুল মুড়ে আরো দুটো সংখ্যা বার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ১১-র বাইনারি সংখ্যা (ছবি ১০১) আর ২৩-এর বাইনারি সংখ্যা (ছবি ১০২)।

১১ = ১০১১
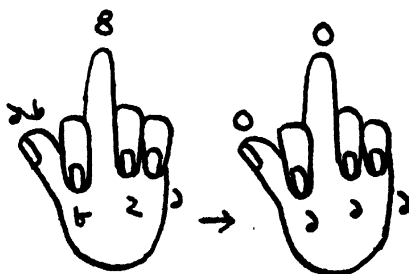
ছবি ১০১
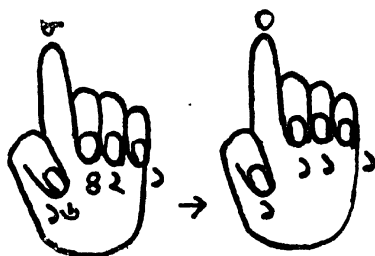
২৩=১০১১১

ছবি ১০২

আঙুল না-মুড়ে বা ভাগ না-করেও বাইনারি সংখ্যা লেখা যায় যদি এই রকম একটা ছক তৈরি করে নেওয়া হয়। ছকটা পরের দু' পাতায় ছেপে দেওয়া হল।

সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা				
	১৬	৮	৪	২	১
০					০
১					১
২				১	০
৩				১	১
৪			১	০	০
৫			১	০	১
৬			১	১	০
৭			১	১	১
৮		১	০	০	০
৯		১	০	০	১
১০		১	০	১	০
১১		১	০	১	১

সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা				
	১৬	৮	৪	২	১
১২		১	১	০	০
১৩		১	১	০	১
১৪		১	১	১	০
১৫		১	১	১	১
১৬	১	০	০	০	০
১৭	১	০	০	০	১
১৮	১	০	০	১	০
১৯	১	০	০	১	১
২০	১	০	১	০	০
২১	১	০	১	০	১
২২	১	০	১	১	০
২৩	১	০	১	১	১
২৪	১	১	০	০	০
২৫	১	১	০	০	১
২৬	১	১	০	১	০
২৭	১	১	০	১	১
২৮	১	১	১	০	০
২৯	১	১	১	০	১
৩০	১	১	১	১	০
৩১	১	১	১	১	১

ছবি ১০৩

১০৩নং ছবির ছকে লক্ষ্য কর, পাঁচটা আঙুলের বদলে 'বাইনারি সংখ্যা' নামে পাঁচটা সারি রয়েছে। এখানে ১৬, ৮, ৪, ২ আর ১—এই পাঁচটা সংখ্যা প্রয়োজন মতো একটার সঙ্গে আরেকটা যোগ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত

করা হয়েছে। যেমন ১৩ - এই সংখ্যাটার বাইনারি সংখ্যা বার করতে গেলে বাইনারি সংখ্যা বলে লেখা সারির ৮, ৪ আর ১-কে যোগ করতে হয়। তাই ১৩-এর ডান পাশে লেখা ৮, ৪ আর ১নং সারির নির্দিষ্ট ঘর তিনটেয় লেখা হয়েছে '১', আর ২-কে যোগ করতে হয়নি বলে সেই ঘরে লেখা হয়েছে '०'। ৩১-এর চেয়ে বেশী কোন সংখ্যার বাইনারি সংখ্যা পেতে হলে বাইনারি সংখ্যা বলে লেখা ১, ২, ৪, ৮ আর ১৬—এই পাঁচটা সারির সঙ্গে যোগ করতে হবে আরো একটি সারি। সেটা হবে ৩২। এই ছ'টা সারি ব্যবহার করে আমরা ৬৩ অবধি যে-কোন সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে পারি।

ম্যাজিক কার্ডের খেলা

পাঁচটা কার্ড নিয়ে ম্যাজিক এই কার্ডের খেলা। প্রত্যেকটা কার্ডে এলোমেলো কতকগুলো সংখ্যা লেখা থাকে। খেলা দেখাবার সময় দর্শককে বলা হয়, আপনি ১ থেকে ৩১-এর মধ্যে যে-কোন একটা সংখ্যা মনে মনে ভেবে নিন। এরপর দর্শককে বলা হয়, এই পাঁচটা কার্ড ভাল করে দেখে বলুন তো, কোন্ কোন্ কার্ডে আপনার 'মনে মনে ভাবা' সংখ্যাটা রয়েছে। দর্শক সেই সেই কার্ডগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া যাবে তিনি কোন সংখ্যাটা ভেবেছেন। কী করে এরকম ম্যাজিক হয়? এটাও বাইনারি সংখ্যার ব্যাপার। আগে ম্যাজিক কার্ড তৈরি করাটা শিখিয়ে দিই, তারপরে বলব কি করে এটা হচ্ছে। একটা কাগজ নিয়ে পরের পাতা দেখে সংখ্যাগুলো ওই ভাবে লিখে নাও। (ছবি ১০৪)

০ থেকে ৩১ অবধি প্রত্যেকটার সংখ্যা বাইনারি সংখ্যাটা এখানে প্রথমে ছক করে লিখে নেওয়া হয়েছে। তারপর ডান পাশে ম্যাজিক কার্ডের পাঁচটা সারি তৈরি করা হয়েছে (ক, খ, গ, ঘ ও ঙ)। ম্যাজিক কার্ডের সংখ্যাগুলো পাবার জন্যে প্রতিটি বাইনারি সংখ্যাকে সমমূল্যের সাধারণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয়েছে। যেমন ১৫-এর বাইনারি রূপ হচ্ছে

(ঘ)	(গ)	(খ)	(ক)
১	১	১	১

ম্যাজিক কার্ডে তাই ১৫ দিয়ে গুণ করে লেখা হয়েছে—

(ঘ)	(গ)	(খ)	(ক)
১৫	১৫	১৫	১৫

আবার ১৩-র বাইনারি রূপ হচ্ছে—

(ঘ) (গ) (খ) (ক)
১, ১, ০, ১

১৩ দিয়ে এই বাইনারি সংখ্যাকে গুণ করে ম্যাজিক কার্ডে তাই লেখা হয়েছে—

(ঘ) (গ) (খ) (ক)
১৩, ১৩, ০, ১৩

শূন্যগুলো ম্যাজিক কার্ডে লেখা হয়নি, জায়গাগুলো ফাঁকা রাখা হয়েছে।

বাইনারি সংখ্যা						ম্যাজিক কার্ড				
	ঙ	ঘ	গ	খ	ক	ঙ	ঘ	গ	খ	ক
০					০					
১					১					১
২				১	০				২	
৩				১	১				৩	৩
৪			১	০	০			৪		
৫			১	০	১			৫		৫
৬			১	১	০			৬	৬	
৭			১	১	১			৭	৭	৭
৮		১	০	০	০		৮			
৯		১	০	০	১		৯			৯
১০		১	০	১	০		১০		১০	
১১		১	০	১	১		১১		১১	১১
১২		১	১	০	০		১২	১২		
১৩		১	১	০	১		১৩	১৩		১৩
১৪		১	১	১	০		১৪	১৪	১৪	
১৫		১	১	১	১		১৫	১৫	১৫	১৫
১৬	১	০	০	০	০	১৬				
১৭	১	০	০	০	১	১৭				১৭
১৮	১	০	০	১	০	১৮			১৮	
১৯	১	০	০	১	১	১৯			১৯	১৯
২০	১	০	১	০	০	২০		২০		

বাইনারি সংখ্যা						ম্যাজিক কার্ড				
	ঙ	ঘ	গ	খ	ক	ঙ	ঘ	গ	খ	ক
২১	১	০	১	০	১	২১		২১		২১
২২	১	০	১	১	০	২২		২২	২২	
২৩	১	০	১	১	১	২৩		২৩	২৩	২৩
২৪	১	১	০	০	০	২৪	২৪			
২৫	১	১	০	০	১	২৫	২৫			২৫
২৬	১	১	০	১	০	২৬	২৬		২৬	
২৭	১	১	০	১	১	২৭	২৭		২৭	২৭
২৮	১	১	১	০	০	২৮	২৮	২৮		
২৯	১	১	১	০	১	২৯	২৯	২৯		২৯
৩০	১	১	১	১	০	৩০	৩০	৩০	৩০	
৩১	১	১	১	১	১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১

ছবি ১০৪

এবার বলি কি করে ম্যাজিক দেখানো হয়। ধরো, একজন লোক বলল, সে যে-সংখ্যাটা স্থির করেছে সেটা রয়েছে ক, খ আর ঘ কার্ডে। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পার, সে ১১ সংখ্যাটাকে মনে মনে ধরেছে। কি করে বলবে? ম্যাজিক দেখাবার সময় মনে রাখতে হবে, ক কার্ডের মূল্য হচ্ছে ১, খ কার্ডের ২, গ কার্ডের ৪, ঘ কার্ডের ৮ আর ঙ কার্ডের মূল্য ১৬। দর্শক যে-যে কার্ড দেখাবে, সেগুলোর মূল্য যোগ করলেই সে যে সংখ্যাটা ধরেছে বেরিয়ে পড়বে।

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে। ধরো আমরা মনে মনে স্থির করেছি ২০। এই ২০ সংখ্যাটা রয়েছে 'ঙ' আর 'গ' ম্যাজিক কার্ড দুটোয়। আমরা জানি 'ঙ' কার্ডের মূল্য ১৬, আর 'গ' কার্ডের মূল্য ৪। তাই 'ঙ' আর 'গ' কার্ডের মূল্য যোগ করলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি ২০।

ম্যাজিক দেখাবার আগে পাঁচটা সরু পিচবোর্ড কেটে নিয়ে তার ওপর সংখ্যাগুলো লিখে নাও। তাহলে খুব সুবিধে হবে।

এই খেলাটাকে আরো আকর্ষণীয় করে দেখানো যায়। 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' আর 'ঙ', এই পাঁচটা কার্ডকে পাঁচ রকম রঙ করে নাও। ধরো 'ক' টা হল লাল, 'খ' টা নীল, 'গ' টা হলদে, 'ঘ' টা সবুজ আর 'ঙ' টা সাদাই রইল। এবার আর ম্যাজিক দেখাবার সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, কোন্ কোন্ কার্ডে আপনার সংখ্যাটা আছে বলুন। শুধু বললেই হবে, কোন্ কোন্ রঙের কার্ডে আপনার সংখ্যাটা আছে। রঙগুলো জানতে পারলেই তুমি বলে দিতে পারবে তিনি কোন্ সংখ্যাটা ধরেছেন। তুমি শুধু মনে রাখবে কোন রঙের কার্ডটার মূল্য কত।

ভীতু কার্ডের খেলা

আমরা সবাই জানি ভেড়ারা কি রকম ভীতু হয়। একবার লাঠি তুললেই সব এক জায়গায় এসে জড় হয় মাথা নীচু করে। শুধু ভেড়া কেন, এমন ভীতু মানুষেরও কমতি নাই যারা শুধু পুলিশের হাতে লাঠি খাওয়ার ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে। যা বলা হয় তাই করে। এরা কখনো নিয়ম ভাঙে না। কিন্তু এরকম কতকগুলো কার্ডের কথা কি কেউ শুনেছে, যাদের মাত্র পাঁচবার লাঠির খোঁচা মারলেই ভয়ের চোটে যে যার জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে? হ্যাঁ—সত্যি এইরকম কার্ড আছে। এই পাতাটা ওল্টালেই যে ছবিটা (ছবি ১০৫) দেখতে পাবে ওখানে ওইরকম ৩২টা কার্ড রয়েছে। কার্ডগুলোর গায়ে ০ থেকে শুরু করে পর পর ৩১ অবধি সংখ্যা লেখা আছে। এই কার্ডগুলো ধরে এলোমেলো করে মিশিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু হলে কি হবে—ওই যে বললাম, কার্ডগুলো ভীতুর ডিম। ওই যে কতকগুলো ফুটো দেখা যাচ্ছে না কার্ডগুলোর মাথার দিকে, ওই ফুটোগুলোর মধ্যে একটা কাঠি গুঁজে পাঁচবার খোঁচা মেরে একটু নেড়েচেড়ে দিলেই হবে। অমনি ওরা সবাই ০ থেকে ৩১ অবধি পরপর এক সারিতে দাঁড়িয়ে পড়বে। কথাটা বিশ্বাস হল না তো? ঠিক আছে, তোমরা আগে বরং ওই রকম বত্রিশটা কার্ড নিজেরাই তৈরি করে নাও। খুঁজে দেখ, বাড়িতে নিশ্চয় বাতিল করে দেওয়া একটা পুরোনো তাসের প্যাকেট পেয়ে যাবে। এর থেকে ৩২টা তাস তুলে নাও। এবার প্রত্যেকটা তাসের যে কোন একটা লম্বা দিক বরাবর পাঁচটা ফুটো করে নাও পরপর। যেমন রয়েছে ১০৫নং ছবির '০' সংখ্যা লেখা কার্ডটায়। ফুটোগুলো এমন ভাবে করতে হবে যাতে তাসগুলো এক জায়গায় জড় করলে

ফুটোগুলো ঠিক একটার ওপর আরেকটা পড়ে। তার মানে পাঁচটা ফুটোর যে-কোন একটার মধ্যে একটা কাঠি ঢোকালেই সেটা বত্রিশটা তাসকে একসঙ্গে গেঁথে ফেলবে। তাসগুলো যাতে সহজে এক জায়গায় জড় করা যায় আর একটা ফুটোর ওপর
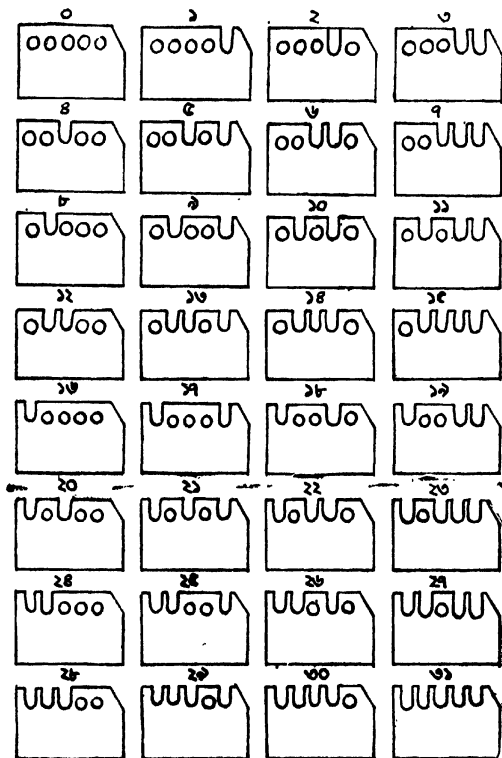
ছবি ১০৫

আরেকটা ফুটো ঠিকমতো পড়ে, তার জন্যে তাসগুলোর ডান কোণটা তেরছা করে কেটে দিতে পার। এবার একটা একটা করে তাস নাও আর ১০৫নং ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ঠিক জায়গা-

মতো এক একটা ফুটোকে কাঁচি দিয়ে কেটে বড় করে দাও। যেমন ১০৫নং ছবির ৩ সংখ্যা লেখা কার্ডটার ডান দিকের ফুটো ফুটোকে কেটে বড় করা হয়েছে।

সব কার্ডগুলো কাটা হয়ে গেলে এবার কার্ডগুলোর গায়ে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ০ থেকে ৩১ অবধি প্রতিটি সংখ্যা লিখে দাও। এবার কার্ডগুলোকে সব এলোমেলো করে যেমন খুশী মিশিয়ে দাও। এইবারই আসল মজা। এলোমেলো কার্ডগুলোকে একগোছ ক'রে ডান দিকের গর্তের মধ্যে একটি কাঠি ঢুকিয়ে দাও। কাঠিটা একটু উঁচু করলেই দেখবে কতকগুলো কার্ড কাঠির সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে এসেছে আর কতকগুলো পড়ে রয়েছে নীচে। গুনলে দেখতে পাবে ঠিক আধাআধি ভাগ হয়ে গেছে। যে কার্ডগুলো কাঠির সঙ্গে ওপরে উঠে এসেছে, সেগুলোকে এবার এক গোছ করে কাঠির থেকে বাইরে বার করে বাকী কার্ডগুলোর ওপরে রেখে দাও। এবার আবার কাঠিটা ঢোকাও কার্ডের দ্বিতীয় গর্তের মধ্যে (ডান দিক থেকে ধরলে)। আবার আগের মতো কাঠিটা উঁচুতে তুলে ধরো। ওপরে উঠে আসা কার্ডগুলোকে কাঠি থেকে খুলে বাকী কার্ড-গুলোর ওপরে রাখ। এইভাবে ডান দিক থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি গর্তের মধ্যে একবার করে কাঠিটা পোরো, আর তারপর কাঠিটাকে ওপরে তুলে ধর। ওপরে উঠে আসা কার্ডগুলোকে কাঠি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পড়ে-থাকা বাকী কার্ডগুলোর ওপরে রাখ। পাঁচবার পাঁচটা গর্তের মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে কার্ডগুলো এইভাবে নাড়াচাড়া করার পর দেখবে আমার কথাই সত্যি। কার্ডগুলো ভেড়ার পালের মতো এক সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ০ থেকে ৩১ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা ঠিক পরপর যেন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে চোখ বন্ধ করেও এই খেলা দেখানো যায়। আরো মজা হয় যদি কার্ডের গায়ে কিছু লিখে রাখা হয়। কার্ডগুলো মিশিয়ে রাখলে তখন সহজে তার মানে বোঝা সম্ভব হবে না, কিন্তু

পাঁচবার কাঠির খোঁচা খেলেই কার্ডগুলো পরপর সাজানো হয়ে যাবে, কি লেখা আছে তার মানেটা বুঝতেও তখন আর কোন অসুবিধে থাকবে না।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে এ রকম হল কি করে? খুবই সোজা ব্যাপার। ০ থেকে ৩১ অবধি প্রতিটি সংখ্যাকে এখানে কার্ডের গায়ে ফুটো করে বাইনারি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। ১·৫নং ছবির সঙ্গে মেলালেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। যেমন ধরো ৯-এর বাইনারি রূপ হচ্ছে ১০০১ (১·৩নং ছবি অনুসারে)। এবার ১·৫নং ছবির ৯নং কার্ডটার সঙ্গে মেলালেই বুঝতে পারবে লম্বা ফুটোগুলো হচ্ছে '১'-এর সমান, আর ছোট ফুটোটা হচ্ছে '০'-এর সমান। এইভাবে কার্ডগুলোর গায়ে ছোট আর বড় ফুটো করেই আমরা বাইনারি সংখ্যা লিখে রেখেছি। ওদিকে ১·৩নং ছবিতে দেখো, ০ থেকে ৩১ অবধি সংখ্যাগুলো লিখতে বাইনারি সংখ্যার পাঁচটি সারির প্রয়োজন পড়েছে – ১, ২, ৪, ৮ ও ১৬। এইজন্যেই পাঁচবার পরপর কাঠি ঢুকিয়ে কার্ডগুলো ওইভাবে নাড়াচাড়া করতেই ওগুলো পর পর সাজান হয়ে গেছে। ০ থেকে ৩১ অবধি লেখা কার্ডের বদলে আমরা যদি ০ থেকে ৬৩ অবধি লেখা কার্ড নিতাম তাহলে ছ'বার কাঠি ঢুকিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করলেই সব সাজানো হয়ে যেত। তবে সেখানে প্রত্যেকটা কার্ডের গায়ে প্রথমেই ছ'টা ক'রে ফুটো করে নিতে হত। কারণ, ০ থেকে ৬৩ অবধি প্রতিটি সংখ্যাকে বাইনারি পদ্ধতিতে লিখতে হলে ছ'সারি বাইনারি সংখ্যার প্রয়োজন—১, ২, ৪, ৮, ১৬ এবং ৩২।

ব্রহ্মার মন্দির

শোনা যায় বেনারসে একটি মন্দিরে পুরোহিতরা এখনো একটা হিসেব কষে যাচ্ছেন। এই হিসেব শেষ হওয়া মাত্রই নাকি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, আর মন্দিরটাও ভেঙে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। এই হিসেব কষার মধ্যে কিন্তু দারুণ মজার ব্যাপার রয়েছে। একটা কাঠির মধ্যে পরপর চৌষট্টিটা সোনার চাকতি পরানো রয়েছে। প্রত্যেকটা চাকতি ভিন্ন ভিন্ন মাপের। সবচেয়ে ছোট চাকতিটা আছে সবার ওপরে আর তারপর ক্রমে ক্রমে চাকতির আকার বাড়তে বাড়তে নীচের দিকে নেমে গেছে। সবচেয়ে তলার চাকতিটা সবচেয়ে বড় মাপের। পরের পাতায় ছবিতে (১০৬নং) এই রকম তিনটে চাকতির একটা সারি দেখান হয়েছে। যে কাঠিটায় চাকতিগুলো পরানো আছে তার পাশেই আছে আরো দুটো কাঠি। চাকতিগুলোকে একটা একটা করে সরিয়ে পাশের যে-কোন একটা ফাঁকা কাঠির মধ্যে এমন ভাবে নিয়ে যেতে হবে যাতে সেগুলো ঠিক আগের মতোই ছোট থেকে বড়, পরপর বসানো থাকে। তবে একটা কথা—চাকতি সরাবার সময় কখনোই কোন বড় আকারের চাকতিকে ছোট চাকতির ওপর বসানো যাবে না।

তোমরা কি বলতে পার, এই তিনটে চাকতিকে এক কাঠি থেকে আরেক কাঠিতে সরাতে হলে ক'বার নাড়াচাড়া করতে হবে? সাত বার। চাকতির সংখ্যা যদি তিনের জায়গায় চার হয় তাহলে

সাতের জায়গায় পনের বার সরাতে হবে। পাঁচটা চাকতি থাকলে মোট একত্রিশ বার নাড়াচাড়া করতে হবে। আর বেনারসের মন্দিরের মতো যদি ৬৪টা চাকতি থাকে তাহলে চাকতি সরাতে হবে—১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৫ বার। যদি ধরাও যায় মন্দিরের পুরোহিতরা প্রতি সেকেণ্ডে একটা করে দিন রাত শুধু চাকতি সরিয়ে যাচ্ছে, তবু সব চাকতি ঠিকমতো সরাতে কয়েক লক্ষ বছর পেরিয়ে যাবে। কাজেই ততদিনে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা বলা না গেলেও এটা নিঃসন্দেহ যে মন্দিরের আর চিহ্নটিও অবশিষ্ট থাকবে না। একটা সোজা নিয়ম আছে যা দিয়ে হিসেব করে বলে দেওয়া যায় চাকতিগুলো একটা কাঠি থেকে আরেকটা কাঠিতে সরাবার সময় ক'বার নাড়াচাড়া করতে হবে। নিয়মটা হচ্ছে—চালের সংখ্যা $=২^{ক}-১$ (ক = চাকতির সংখ্যা)

তাই, চাকতির সংখ্যা যখন ৩, তখন চালের সংখ্যা $=২^{৩}-১$

$=৮-১=৭$

চাকতির সংখ্যা যখন ৪, তখন চালের সংখ্যা $=২^{৪}-১$

$১৬-১=১৫$

চাকতির সংখ্যা যখন ৫, তখন চালের সংখ্যা $=২^{৫}-১=৩১$

এইভাবে বেনারসের মন্দিরের ৬৪টা চাকতিতে সরাতে গেলে

চাল লাগবে $=২^{৬৪}-১$

এবার দেখা যাক চাকতিগুলো কিভাবে সরাতে হবে। তিনটে চাকতির একটা সারি না হয় ধরা যাক। তার মানে সাতটা চাল লাগবে। নীচের ছবিতে (১০৬নং) পরপর সাতটা চাল দেখান হয়েছে। এখানে তিনটে চাকতিকে পরপর ক, খ আর গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে চালগুলো এই রকম—
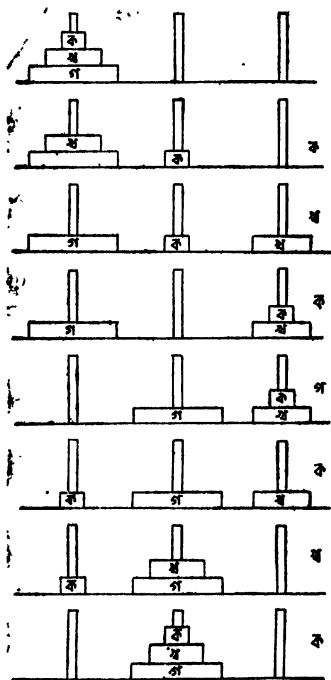
ছবি ১০৬

প্রথম চাল ক চাকতির—ক

দ্বিতীয় চাল খ চাকতির—খ

তৃতীয় চাল ক চাকতির—ক

চতুর্থ চাল গ চাকতির—গ

পঞ্চম চাল ক চাকতির—ক

ষষ্ঠ চাল খ চাকতির খ

সপ্তম চাল ক চাকতির—ক

অর্থাৎ সংক্ষেপে লেখা যায়—ক, খ, ক, গ, ক, খ, ক।

এবার তোমাদের একটা নিয়ম দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে চাকতি না চেলেও বলে দেওয়া যাবে, কোন্ চাকতির পর কোন্ চাকতি চালতে হবে। এবারেও আমাদের বাইনারি সংখ্যার সাহায্য নিতে হবে। তিনটে চাকতির খেলা হলে বাইনারি সংখ্যার প্রথম তিনটে সারি শুধু নিতে হবে। ১০৩ নম্বর ছবি দেখে এই প্রথম তিনটে সারির বাইনারি সংখ্যা নীচে লিখে নেওয়া হয়েছে।

বাইনারি সংখ্যা (তিনটি সারি)

	৪	২	১	
	গ	খ	ক	চাল
১			১	ক
২		১	০	খ
৩		১	১	ক
৪	১	০	০	গ
৫	১	০	১	ক
৬	১	১	০	খ
৭	১	১	১	ক

এবার দেখ বাইনারি সংখ্যার তিনটে সারির নাম দেওয়া হয়েছে ক, খ আর গ। অর্থাৎ চাকতি তিনটের নাম অনুসারে। এবার লক্ষ্য কর 'চাল' নাম লেখা সারিটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে। ধরো, প্রথম চাল যে 'ক' হবে সেটা বোঝা গেছে ওই সারির বাইনারি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ডানদিকের কোন্ ঘরে ১ রয়েছে সেটা দেখে। এখানে সবচেয়ে ডানদিকে ১ রয়েছে বাইনারি সংখ্যার 'ক' সারির ঘরে, তাই প্রথম চালও হচ্ছে 'ক'। দ্বিতীয় চালের বেলায় দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে ডান দিকে যে ঘরটায় ১ রয়েছে সেটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যার 'খ' সারির ঘর, তাই দ্বিতীয় চাল হচ্ছে 'খ'। এমনি ভাবে তৃতীয় চালের সময় দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে ডানদিকের ১টা রয়েছে 'ক' সারিতে, তাই তৃতীয় চাল 'ক'। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চালও একই ভাবে বেরিয়ে আসছে।

এখন যদি তিনটে চাকতির বদলে চারটে চাকতি নেওয়া যায়, তাহলে তারও চালগুলো ঠিক একই ভাবে বার করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে বাইনারি সংখ্যার তিনটে সারি নিলে চলবে না, নিতে হবে চারটে সারি। তেমনি পাঁচটা চাকতির বেলায় দরকার হবে ৫ সারির বাইনারি সংখ্যা।

চারটে চাকতি নিয়ে খেলার সময় যে চালগুলো লাগে নীচে বার করে দেখিয়ে দেওয়া হল।

বাইনারি সংখ্যা (চার সারি)

	ঘ	গ	খ	ক	
	৮	৪	২	১	চাল
১				১	ক
২			১	০	খ
৩			১	১	ক
৪		১	০	০	গ
৫		১	০	১	ক
৬		১	১	০	খ
৭		১	১	১	ক
৮	১	০	০	০	ঘ
৯	১	০	০	১	ক
১০	১	০	১	০	খ
১১	১	০	১	১	ক
১২	১	১	০	০	গ
১৩	১	১	০	১	ক
১৪	১	১	১	০	খ
১৫	১	১	১	১	ক

খেলার নাম 'নিম্'

দু'জনে মিলে যেসব অঙ্কের খেলা নিয়ে মেতে থাকা যায় তার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে পুরোনো হচ্ছে 'নিম্ খেলা'। চীনদেশেই খুব সম্ভব প্রথম এই খেলার প্রচলন।

কাগজের টুকরো, পয়সা বা ক্যারমের ঘুঁটি নিয়েও খেলা যেতে পারে। নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বারোটা ঘুঁটি তিন সারিতে সাজানো হয়েছে। প্রথম সারিতে তিনটে, দ্বিতীয় সারিতে চারটে আর তৃতীয় সারিতে রয়েছে পাঁচটা ঘুঁটি। খেলোয়াড় দু'জন পরপর চাল দেবে। এক-একবারে এক বা একাধিক ঘুঁটি তুলে নিতে হবে, কিন্তু সেটা যে-কোন একটা সারি থেকেই নিতে হবে। যে শেষ ঘুঁটিটা তুলবে সেই জিতবে। তোমরা খেলে দেখ তো, জেতবার কায়দাটা বার করতে পারো কিনা।
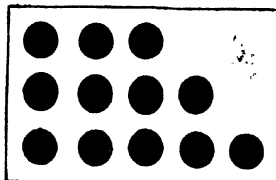
ছবি ১০৭

কয়েকবার বেশ মন দিয়ে খেললেই বুঝতে পারবে যে, তুমি চাল দেবার পর যে-কোন দু'টো সারিতে যদি একের চেয়ে বেশী ঘুঁটি থাকে এবং ঘুঁটির সংখ্যা যদি এই দু'টো সারিতেই এক হয়, তাহলে জেতা যাচ্ছে। আরো কয়েকবার খেলার পর ঠিক বুঝতে পারবে যে, তোমার চাল দেবার পর যদি প্রথম সারিতে একটি ঘুঁটি থাকে, দ্বিতীয় সারিতে দু'টো ঘুঁটি থাকে, আর তৃতীয় সারিতে যদি তিনটে

ঘুঁটি থাকে, তাহলেও শেষ পর্যন্ত তুমি জিততে পারছ। তবে প্রথম খেলোয়াড় যদি প্রথম চালেই প্রথম সারির থেকে দু'টো ঘুঁটি তুলে নেয়, তাহলে আর তাকে হারানো সম্ভব নয়।

এই খেলাটাতেও বাইনারি পদ্ধতি প্রয়োগ করে খেললে জেতা সম্ভব। প্রথমে প্রতি সারির ঘুঁটির সংখ্যাকে পরপর বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত করে লিখে নাও। অর্থাৎ এখানে যেমন হচ্ছে—

ঘুঁটি	বাইনারি সংখ্যা		
	৪	২	১
৩		১	১
৪	১	০	০
৫	১	০	১

এবার এই বাইনারি সংখ্যাগুলোকে যোগ দাও—

ঘুঁটি	বাইনারি সংখ্যা		
	৪	২	১
৩		১	১
৪	১	০	০
৫	১	০	১
	২	১	২

যোগফলের মধ্যে ০ বা জোড় সংখ্যা ছাড়া যদি কোন বিজোড় সংখ্যা থাকে, তাহলে সেটাকে পাল্টে 'জোড়' সংখ্যা বা '০' করতে পারলেই জেতা যাবে। তার মানে, একটা সারি থেকে এমন ভাবে ঘুঁটি সরাতে হবে যাতে সেই সারির বাইনারি সংখ্যাটা যায় পাল্টে, আর যোগফলের সব অঙ্কগুলোই হয় জোড় হয়, নয়তো '০'। এখানে দেখা যাচ্ছে একমাত্র প্রথম সারির বাইনারি সংখ্যা ১১-কে পাল্টে ১-লিখতে পারলেই সেটা সম্ভব। বাইনারি সংখ্যা ১-কে সাধারণ সংখ্যায় পরিবর্তিত করলে ১-ই হয়। তার মানে প্রথম সারির তিনটি ঘুঁটি থেকে দু'টিকে সরিয়ে নিলেই খেলা জেতার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সারির সংখ্যা বাড়িয়ে বা খুশীমতো প্রতি-সারিতে যে-কোন সংখ্যার ঘুঁটি বসিয়েও এই খেলা সম্ভব। তবে খেলা জেতবার নিয়ম ওই একই। প্রতি সারির ঘুঁটির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত করা, তারপর বাইনারি সংখ্যাগুলোকে যোগ করা এবং যোগফলের মধ্যে কোন বিজোড় সংখ্যা থাকলে সেটিকে পাল্টে জোড় সংখ্যা বা '০' করার জন্তে প্রয়োজন-মতো ঘুঁটি সরানো।

এবার ধরো, প্রথম সারিতে ৮টা ঘুঁটি আছে, দ্বিতীয় সারিতে ১১টা ঘুঁটি, আর তৃতীয় সারিতে আছে ১৩টা ঘুঁটি। এখন যদি তোমার চাল হয়, কোন্ সারি থেকে ক'টা ঘুঁটি সরালে জিততে পারবে বলতো ?

উত্তরটা বলে দিচ্ছি। হয় দ্বিতীয় সারি থেকে ৬টা ঘুঁটি সরাতে হবে, নয়তো তৃতীয় সারি থেকে ১০টা ঘুঁটি। কী করে উত্তরটা বেরল সেটা তোমরা ঘুঁটির সংখ্যাগুলোকে বাইনারি পদ্ধতিতে লিখে আগের মতো যোগ দিলেই বুঝতে পারবে।

খেলার নাম 'ট্যাক্‌-টিক্স'

ডেনমার্কের পিয়েট হাইনের কথা আগেই তোমাদের বলেছি। এই খেলাটাও তাঁরই আবিষ্কার। খেলাটা 'নিম'-এর মতোই কিন্তু আরো মজার, কারণ 'ট্যাক্‌-টিক্স'-এর এমন কয়েকটা খেলা আছে যেখানে অঙ্ক এখনো অবধি হার স্বীকার করেছে। কে জিতবে বা কিভাবে খেলা জেতা যায় তার কোন সমাধান বার করা যায়নি।

এবার খেলাটা কি রকম বলছি। এই খেলায় প্রতি সারিতে ঘুঁটির সংখ্যা চার, আর সারির সংখ্যাও চার। যেমন দেখান হয়েছে ১০৮নং ছবিতে। দু'জন খেলোয়াড় পালা করে ঘুঁটি সরাবে। একসঙ্গে এক বা তার বেশী ঘুঁটি সরানো যাবে। ঘুঁটিগুলো যে বিশেষ একটা

ছবি ১০৮

সারি থেকেই নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে যেখান থেকেই সরানো হোক, বা যে-কটাই সরানো হোক, সেগুলো হবে গায়ে গায়ে

লাগানো ঘুঁটি। যেমন প্রথম খেলোয়াড় যদি ২ আর ৩ নম্বর ঘুঁটিটা সরায়, দ্বিতীয় খেলোয়াড় কিন্তু ১ আর ৪টা সরাতে পারবে না। খেলার নিয়ম হচ্ছে, যে শেষ ঘুঁটিটা সরাবে সেই হারবে।

মজা হচ্ছে, এই খেলাটায় যদি শুধু তিন সারিতে তিনটে করে ঘুঁটি বসিয়ে খেলা হয়, খুব সহজেই একটা জেতবার কায়দা শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রথম খেলোয়াড় যদি প্রথমেই ঠিক মাঝের ঘুঁটিটা সরিয়ে নেয় তাহলে আর তাকে হারানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া সে যদি যে কোনো কোণ থেকে একটা ঘুঁটি তুলে নেয় বা মাঝের সারির তিনটে ঘুঁটি একসঙ্গে তুলে নেয়, তাহলেও আর তাকে হারানো যাবে না।

১. 'ট্যাক্-টিক্সের' একটি ধাঁধা

ট্যাক্-টিক্স খেলতে খেলতে এক সময় দেখা গেল বোর্ডের ওপর নীচের ঘুঁটি ক'টা শুধু পড়ে রয়েছে। (১০৯ নং ছবি) এবার যদি তোমার চাল হয়; বলতো কোন্ কোন্ ঘুঁটি সরালে তোমার জেতা কেউ আটকাতে পারবে না ?

ছবি ১০৯

২. 'ট্যাক্-টিক্সের' আরেকটি ধাঁধা
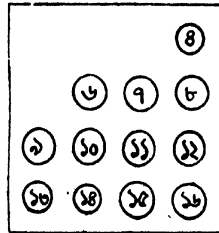
ট্যাক-টিক্সের আরেকটা খেলায় এক সময় দেখা গেল বোর্ডে শুধু নীচের ঘুঁটি ক'টা পড়ে আছে। এর থেকে কোন্ ঘুঁটিগুলো সরালে তুমি জিততে পারবে ?
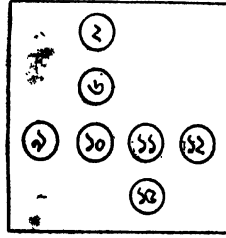
ছবি ১১০

উত্তর ১। ৯-১০-১১-১২ নম্বর ঘুঁটি চারটে সরাতে পার বা ৪-৮-১২-১৬ নম্বর ঘুঁটিগুলো।

২। ৯ বা ১০ নম্বর ঘুঁটি সরাতে হবে।

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

সিঁড়ি ভাঙা শব্দের খেলা

সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক তো আমরা সবাই কষেছি। এক ধাপ এক ধাপ করে এগিয়ে উত্তরটা খুঁজে বার করতে হয়। এবার আমরা সংখ্যার বদলে শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করব। ঠিক ওই সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো এই খেলাতেও ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে।

একটা প্রশ্ন দিয়ে খেলা শুরু করছি। বলতো, দেবতা থেকে দানব হ'তে কম ক'রে কত ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছ—দেবতা থেকে দানব। বুঝতে পারছ না কি বলছি? এই দেখ—মাত্র ছ' ধাপ ভাঙতেই দেবতা কেমন দানব হয়ে গেছে—

দেবতা থেকে দানব

১ম ধাপ : দেখতা (যা দেখা যায়)

২য় ধাপ : দেখন (দর্শন)

৩য় ধাপ : মাখন

৪র্থ ধাপ : মানন (মানা)

৫ম ধাপ : মানব

৬ষ্ঠ ধাপ : দানব

কি, এবার বিশ্বাস হল তো? খেলার সময় একটা কথা খেয়াল রাখবে কিন্তু। এক ধাপ থেকে পরের ধাপে যাবার সময় শুধু একটি বর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে। অবশ্য আ-কার, ই-কার, উ-কার, ঋ-কার, র-ফলা, য-ফলা, অনুস্বার ইত্যাদি বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টানো যাবে। যেমন ধরো, আদর থেকে আকর-ও পেতে পার, কিংবা আকার-ও লিখতে পার। কোনো ক্রিয়াপদকে কিন্তু শব্দ হিসেবে ধরা চলবে না।

তোমরা দেখেছ, দেবতা থেকে দানব হতে ছ'ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। লক্ষ্য করো, দেবতা থেকে মানব হতে পাঁচ ধাপ সিঁড়ি ভাঙাই যথেষ্ট। ব্যাপারটা ভারী মজার না? মানব থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে রয়েছে দানব।

এবার তোমরা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দেখ তো, বাঁদর থেকে মানব-এ পৌঁছতে পার কিনা। কম করে ক'টা ধাপ পেরোতে হচ্ছে? (পাতার নীচে উল্টো করে উত্তরটা ছাপা আছে)

তোমরা এবার নিজেরা চেষ্টা করে দেখ, আর কি কি ভাবে বাঁদর থেকে মানব, বা দেবতা থেকে দানব তৈরি করতে পার। একটা বাঙলা অভিধান নিয়ে বসলে, তোমরাও পারবে এরকম এক জোড়া ক'রে শব্দ বাছাই ক'রে নতুন নতুন খেলা বানাতে।

বাঁদর থেকে মানব (আট ধাপ)

আদর

আকার

আকাল

মাকাল

মাতাল

মাতন

মানন

মানব

নাপিতের বুদ্ধি

আজ অবধি যত ভাল ভাল গল্প পড়েছি, তার সব ক'টাতেই নাপিতের বুদ্ধির দারুণ প্রশংসা। তা বলে সত্যিই কি নাপিত মাত্রেই বুদ্ধিমান হয়? মোটেই না। আমি স্বীকার করতে রাজী নই। বুদ্ধিমানরা যখন-যেমন তখন-তেমন, ঠিক বুঝেসুঝে পা ফেলে। কিন্তু আমাদের পাড়ার রামু নাপিতকে দেখ, ইস্টবেঙ্গলের এমন সাপোর্টার আমি দুটো দেখিনি। সেদিন রামু বলে কিনা—একটা মোহনবাগানের প্লেয়ারের বদলে আমি দু' দুটো ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টারেরও চুল কাটতে রাজী আছি, বুঝলে?

তোমরাই বলো, রামু নাপিতের কি বুদ্ধি আছে?

[ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা বুদ্ধি আছে। একজনের বদলে দু'জনের চুল কাটলে রোজগারটা যে দু'গুণ হয়।]

ধরো আমি শার্লক হোম্‌স্‌। ডিটেকটিভদের সম্রাট। আর তোমরা যারা এখানে হাজির হয়েছে, সবাই চাও আমার চেলা হতে। অর্থাৎ—ওয়াটসনের পদটা নেবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। ওয়াটসন হতে পারলে যে অনেক মজার মজার গল্প শুনতে পাবে। কিন্তু তা বলে যাকে তাকে আমি ওয়াটসন হতে দিতে পারি না। শার্লক হোমসের ডান হাত হবার জন্যে যোগ্যতা থাকা চাই। বেশ, এক কাজ করা যাক্‌ তাহলে। আমি তোমাদের একটা রহস্য গল্প শোনাব। তোমাদের মধ্যে যে রহস্যভেদ করতে পারবে, তাকেই আমি শাকরেদ করে নেব। শুরু করি তাহলে?

সেদিন সকালবেলায় আরাম কেদারায় শুয়ে চোখ বুজে পাইপ টানছি, হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। 'ভেতরে আসুন'—বলতে সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করে এক ভদ্রলোক মুখ বাড়ালেন। আবার ডাকলাম—আসুন। ভদ্রলোক এবার ভেতরে ঢুকলেন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের চপ্পল···ইত্যাদি ইত্যাদি। চোখ মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম, যে কারণেই তিনি এসে থাকুন, ব্যাপারটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, তিনি নিজেই মুখ খুললেন, 'আমি একটা দারুণ ধাঁধায় পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। ভাবতে ভাবতে মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে। এখন আপনি যদি আমায় একটু সাহায্য করেন।'

আমি বললাম—'আপনার সমস্যাটা আগে শুনি।'

লোকটি এবার যা বলল, তার সারমর্ম অনেকটা এই রকম। লোকটির দেশের বাড়িতে একটা বিরাট পুকুর আছে। পুকুরটা একেবারে গোলাকার। এই পুকুরের ঠিক মধ্যিখানে আছে এক

তালগাছ। এপাড় থেকে ওপাড় অবধি পুকুরটার ব্যাস সিকি মাইল। তালগাছটার কাছে যাবার জন্তে ছোট্ট একটা ভেলাও আছে পুকুরে। পাড়ের ধারে সেটা একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে আটকানো থাকে। একদিন সকাল বেলায় লোকটিকে বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হয়। বাড়িতে তার দ্বিতীয় প্রাণী বলে কেউ নেই। শুধু একটা মালী কাজ করছিল বাগানে। সে সময় তালগাছে বেশ কয়েকটা তাল ধরেছিল। মালীটা পাছে তালগুলো পেড়ে নিয়ে পালায়, সেই ভয়ে বেরোবার আগে ভেলাটাকে জল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল লোকটি। কারণ মালীটা একেবারেই সাঁতার জানত না। ত্রিসীমানায় কোনো দ্বিতীয় বসতিও নেই যে অন্ত কাউকে ডেকে এনে তাল চুরি করবে। ভেলাটাকে সরিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেছল লোকটি। তালচুরি করা মালীর পক্ষে অসম্ভব। ফিরে এসেই লোকটি কিন্তু অবাক হয়ে গেল। মালী তালগুলো চুরি করে পালিয়েছে। কিন্তু তালগুলো ও পাড়ল কি করে? তন্ন তন্ন করে সারা বাগান খুঁজে দেখল লোকটি, যদি কোথাও কোনো সূত্র চোখে পড়ে। এমন কি ইষ্টিসানেও খবর নিল। মালীকে তাল হাতে করে বিকেলের দিকে সবাই যেতে দেখেছে, কিন্তু তার আগে সে আসেনি। কাউকে ডেকেও নিয়ে যায়নি। সব দেখেশুনে লোকটি বুঝতে পারল, চারশো গজ লম্বা একটুকরো দড়ি ছাড়া মালীটার কাছে আর এমন কিছু ছিল না, যাতে সে পুকুর পার হয়ে তাল চুরি করতে পারে। কিন্তু, চারশো চল্লিশ গজ লম্বা একটা দড়ি দিয়ে চারশো চল্লিশ গজ ব্যাস-ওলা একটা পুকুর সে পেরল কি করে? পুকুরের একটা পাড়েই তো কেবল খুঁটি পোঁতা আছে। তাহলে?

তোমরা শুনলে তো সব কথা, এবার বলতো দেখি মালীটা কি ক'রে সাঁতার না-জেনেও গোল পুকুর পেরিয়ে তাল চুরি করেছিল? যে বলতে পারবে তাকে আমি ওয়াটসন করে দেব।

[লোকটা দড়িটার এক প্রান্ত খুঁটিতে বেঁধে দিয়েছিল। তারপর দড়ির অন্য খুঁটটা হাতে নিয়ে পুকুরের পাড় ধরে গোল পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। খুঁটির ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছবার মতো দড়ি তার হাতে ছিল, কারণ পুকুরের ব্যাস সিকি মাইল অর্থাৎ চারশো চল্লিশ গজ। খুঁটির উল্টো দিকে পৌঁছে সে কিন্তু থামেনি। পাড় ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল। দড়িতে টান পড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তখন সে আবার খুঁটির কাছেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ফলে দড়িটা এবার তালগাছের গায়ে উল্টো মুখে জড়াতে শুরু করেছিল। লোকটা যখন পুরো পুকুরটাকে পরিক্রমা করে নৌকো-বাঁধা খুঁটিটার কাছে ফিরে এল, দড়িটা তখন উল্টো ইউ (∩)-এর আকারে তালগাছের গায়ে জড়িয়ে গেছে। এবার দড়িটার শেষ প্রান্তটা সে আবার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। অমনি তৈরি হয়ে গেল দড়ির সাঁকো। এরপর নিশ্চয় তাল পাড়ার কোনো অসুবিধা থাকতে পারে না।]

ম্যানহোলের ঢাকনা

রাস্তার মধ্যে কিছুদূর অন্তর একটা করে লোহার ঢাকনা বসানো থাকে। নিশ্চয় তোমাদের সবারই চোখে পড়েছে এই ঢাকনাগুলো। মাঝে মাঝে এই ঢাকনা খুলে রাস্তার তলার বিরাট নর্দমার ময়লা সাফ করা হয়।

তোমরা যারা খেয়াল করে দেখেছ, তারা জানো এই ঢাকনা-গুলো সব সময়েই গোলাকার হয়। কিন্তু, ঢাকনাগুলো তো চৌকোও হতে পারতো। কি বাধা ছিল গোল না-হয়ে চৌকো হবার? তবু সব জায়গাতেই ম্যানহোলের ঢাকনাগুলো গোলাকার। তোমরা ভেবে বলতো, ঢাকনাগুলো গোল হবার পেছনে কোনো কারণ আছে কি?

[চৌকো গর্তের কোনাকুনি দৈর্ঘ্য (কর্ণ) তার যে কোনো বাহুর চেয়ে বেশী। ফলে একটা চৌকো ঢাকনা যদি খাড়া অবস্থায় একটু ঘুরে যায়—তাহলেই সর্বনাশ। সটান চৌকো গর্ত গলে নর্দমার ভেতরে সেঁধিয়ে যাবে। এই জন্তেই গোল ঢাকনা ব্যবহার করা হয়।]

ঘড়ি মেলানোর খেলা

বষ্ঠিবাবুর বাড়ি বেড়াতে এসেছি সেদিন, দেখি বষ্ঠিবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। 'কি হল মশায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'কি আর হবে। ওই দেখুন—ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি মান্ধাতার আমলের একটা ঘড়ি ঝুলছে। পেণ্ডুলামটা দোল খাচ্ছেনা।

'ঘড়িটা বুঝি খারাপ হয়ে গেছে?'

'আরে না—না, দম দিতে ভুলে গেছি।' বষ্ঠিবাবু বললেন। মুস্কিল কি জানেন, আবার বাড়িতে আর দ্বিতীয় ঘড়ি নেই বা রেডিও নেই। জানলা দিয়ে কাউকে ডেকে যে জেনে নেব কটা বেজেছে, তারও উপায় নেই। আশেপাশে বাড়ি নেই, বড় রাস্তাটাও অনেক দূরে।'

'এক কাজ করুন বরং। আমার বাড়ি চলুন। এই তো কাছেই। একটু চা-ও খেয়ে আসবেন, ঘড়িও মিলিয়ে নিতে পারবেন।' আমি বষ্ঠিবাবুকে বললাম।

'তার মানে আপনি আমাকে গন্ধমাদন পাহাড় বইবার মতো এই ঘড়িটা কাঁধে করে আপনার বাড়ি যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করছেন?'

'তা কেন, ঘড়ি নিয়ে যাবার কি দরকার।'

বষ্ঠিবাবু চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন, 'তাহলে বলুন, আপনার রিস্টওয়াচ বা টেবিল-ঘড়িটা আমাকে দিয়ে দেবেন এখনকার মতো?'

তাতে আমার খুব অসুবিধে হবে। আর তার

কোন প্রয়োজনও নেই। আমার বাড়ি গেলেই তো জানতে পারবেন, ঠিক কটা বাজছে। তারপর ফিরে এসে মিলিয়ে নেবেন।'

বঙ্কিবাবু আমার কথা শুনে বুদ্ধিমানের মতো হাসতে শুরু করলেন। 'বেড়ে বলেছেন। আপনার বাড়ি গিয়ে ঠিক সময়টা ঠিকই জানতে পারব। কিন্তু বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই ঠিকটাতো আর ঠিক থাকবে না। ততক্ষণে যে ঘড়ি বাবাজী বেশ কিছুক্ষণ টিকটিক করার সুযোগ পেয়ে আবার বেঠিক হয়ে যাবে। কাঁটায় কাঁটায় মেলাতে তো পারব না।'

বঙ্কিবাবুকে অমন করে হাসতে দেখে আমার কিন্তু একটুও রাগ হয়নি। বললাম, 'দেখুন না—আপনার ঘড়ি আমি ঠিক মিলিয়ে দেব। চলুন এবার। ও হো—আপনার ঘড়িটায় দম দিয়ে দিন্‌তো।'

'দম্‌ দিয়ে দেব? কিন্তু মেলাব কি করে?' বঙ্কিবাবুর সেই এক প্রশ্ন।

'মেলাতে হবে না। শুধু দম দিয়ে চালু করে দিন।'

বঙ্কিবাবুর ঘড়ি চালু হতে বললাম, ঠিক বেরোবার মুখে এই ভুল ঘড়িতে ক'টা বাজছে সেটা একটা কাগজে লিখে রাখা দরকার।

বঙ্কিবাবু এবার আর কোন প্রশ্ন না করে ভুল ঘড়ি দেখে লিখে নিলেন—'১২টা দেখে বেরোচ্ছি।'

বঙ্কিবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়িতে পৌঁছেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা বেজে পনের মিনিট। বঙ্কিবাবুকে সময়টা লিখে রাখতে বললাম। বঙ্কিবাবুর চা-টা খাওয়া হলে আবার বেরোবার মুখে ঘড়ি দেখলাম—সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। তার মানে বঙ্কিবাবু আমাদের বাড়িতে তিরিশ মিনিট ছিলেন।

বঙ্কিবাবুর সঙ্গে আবার তার বাড়িতে ফিরে এলাম। ঘরে পা দিয়েই দেখলাম ভুল ঘড়িতে বারোটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট হয়েছে। বঙ্কিবাবুকে আবার লিখে নিতে বললাম সময়টা।

'ব্যাস—এবার আপনি ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারেন।'

বঙ্কিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'কি করে মেলাব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যে কাগজটায় সময় লিখেছেন 'ওটা আমায় দিন। আমি হিসেব করে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

[বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ভুল ঘড়িতে দেখেছি = ১২

বাড়ি ফেরার পর ভুল ঘড়িতে দেখেছি = ১২।৫০

সুতরাং বাড়ির বাইরে সময় কেটেছে = ১২।৫০ — ১২ = ৫০ মিনিট

এই ৫০ মিনিটের মধ্যে আমাদের বাড়িতে সময় কেটেছে = ৩০ মিনিট

কাজেই, বঙ্কিবাবুর বাড়ি থেকে আমার বাড়ি যেতে-আসতে সময় লেগেছে = ৫০ — ৩০ = ২০ মিনিট

সুতরাং, আমার বাড়ির ঘড়িতে ৭-৪৫ দেখে বেরোন হয়েছিল, তারপর পথে কেটেছে ১০ মিনিট, তাই বঙ্কিবাবুর বাড়িতে পা দিই যখন, তখন ঠিক সময় ছিল = ৭।৪৫ + ০।১০ = ৭।৫৫ মিনিট

বঙ্কিবাবুর হাতে হিসেবের কাগজটা তুলে দিতে, তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন—একবার, দু' বার—তারপর একগাল হেসে উঠে গেলেন। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ৭-৫৫ করে দিলেন।

আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনা। 'একী! ৭-৫৫ করলেন কেন? আমরা যখন আপনার বাড়িতে পা দিই, ঠিক সেই সময় ৭-৫৫ হয়েছিল। ইতিমধ্যে তো আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। ভুল ঘড়িতে ১২।৫০ দেখে ঢুকেছিলেন, এখন ১২।৫৫, কাজেই—'

বঙ্কিবাবু লাফিয়ে উঠে ঘড়ির কাঁটা দুটো ৭-৬০ করে দিলেন।]

সত্যি-মিথ্যে খেলা

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, দু'জনকে নিয়ে গল্প। এদের একজনের গায়ে আছে লাল জামা, আরেক জনের গায়ে আছে নীল জামা। যে লাল জামা পরেছে সে বলছে: আমি মেয়ে। যে নীল জামা পরেছে সে বলছে: আমি ছেলে। দু'জনের মধ্যে একজন অন্তত মিথ্যে কথা বলছে। কে মিথ্যেবাদী বলতে পার?

[চারটি সম্ভাবনা আছে।

১ম—লাল জামা সত্যি বলছে, নীল জামা সত্যি বলছে
২য়— „ „ সত্যি „ „ „ মিথ্যে „
৩য়— „ „ মিথ্যে „ „ „ সত্যি „
৪র্থ— „ „ মিথ্যে „ „ „ মিথ্যে „

১ম সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাচ্ছে কারণ, বলাই হয়েছে যে কেউ না কেউ মিথ্যে বলেছে।

২য় সম্ভাবনাও গ্রাহ্য হবে না। কারণ, লাল জামা যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তাহলে সে মেয়ে। নীল জামা তাহলে ছেলে। তাহলে নীল জামা তো কই মিথ্যে কথা বলেনি!

একই যুক্তিতে ৩য় সম্ভাবনাও নাকোচ হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে চতুর্থ সম্ভাবনাই ঠিক। দু'জনেই মিথ্যে কথা বলেছে।]

আমেরিকান আবোল-তাবোল

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখ। ছোট করে লিখতে হলে, আমরা এইভাবে লিখি—১. ৪. ৭৮, অর্থাৎ তারিখটা প্রথমে, মাসটা মাঝখানে আর সালটা সবার পরে। আমেরিকানদের কিন্তু সবই কেমন উল্টোধারা। তাই ওরা এভাবে দিন মাস বছর লেখে না। ওরা লেখে—৪. ১. ৭৮। মানে, প্রথমে মাস, তারপর দিন, সবার শেষে বছর। কী মুস্কিল বলো তো। কোন্ পদ্ধতিতে তারিখ লেখা হচ্ছে জানতে না পারলে সব যে ওলট-পালট হয়ে হয়ে যাবে। কেউ ভাববে এপ্রিল মাসের এক তারিখ, কেউ ভাববে জানুয়ারীর চার তারিখ। তবে, মাসের যে-কোন তারিখের বেলায় এই ভুল বোঝার সম্ভাবনা নেই। ধরো, এক জায়গায় লেখা রয়েছে ১. ১৫. ৭৮। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটা আমেরিকান পদ্ধতি। বছরে তো আর পনের মাস হতে পারে না। এবার তোমরা বলতো, এক বছরের মধ্যে ক'টা দিন নিয়ে এরকম গোলমাল হতে পারে ?

[সাধারণ বুদ্ধিতে বলে প্রত্যেক মাসের প্রথম বারোটা দিন নিয়েই যা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। এক বছরে বারোটা মাস, তাই তারিখ লেখার সময় প্রথম সংখ্যাটা মাস বোঝাচ্ছে, না দিন বোঝাচ্ছে, বলা সম্ভব নয়। তাই সোজা হিসেবে, প্রতি বছর ১২ × ১২ বা ১৪৪ দিন এরকম গোলমাল হতে পারে।

উত্তরটা কিন্তু ঠিক হল না। একটা উদাহরণ দিলেই ত্রুটিটা ধরা পড়বে। ধরো, ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের তিন তারিখকে সংক্ষেপে লেখা হল—৩. ৩. ৭৮। যে পদ্ধতিতেই লেখা হোক না, এখানে দিন বা মাস উল্টোপাল্টা হবার ব্যাপার নেই। প্রত্যেক মাসের ১ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে এমনি একটা করে দিন আছে, যখন দিন ও মাস উল্টোপাল্টা হলেও বোঝার কোনো অসুবিধে থাকে না। কাজেই—প্রতি মাসে এগারোটা করে দিনের বেলায় ভুল হতে পারে, অর্থাৎ বছরে ১৩২ দিন।]

কথা বলার ছিরি

জয়ন্তকান্ত জোয়ারদার মশায়ের প্রচুর বয়স হয়েছে, তবু হেঁয়ালি করার অভ্যাসটা যায়নি। এই সেদিনের কথা। কে একজন তাঁর বয়স কত জিজ্ঞেস করেছিল। অমনি মাথা-টাথা চুলকে তিনি বললেন, 'এঁজ্ঞে, তাতো ঠিক মনে নেই। তবে, 'ক' টু দা পাওয়ার টু—অর্থাৎ ক-বর্গ সালে আমার বয়স ছিল 'ক'।'

এমন উত্তর শুনলে যে-কেউ বলবে লোকটা আস্ত পাগল। আসলে কিন্তু তা নয়। জোয়ারদার মশায়ের কথা থেকে সত্যিই তার জন্মের সালটা বার করা যায়। চেষ্টা করে দেখ, পারো কিনা।

[১৯৩৬ সালে জোয়ারদার বাবুর বয়স ছিল ৪৪।

কারণ, $৪৪^২ = ১৯৩৬$

তার মানে, তাঁর জন্মের সাল = ১৯৩৬-৪৪

= ১৮৯২

জোয়ারদার বাবুর কথার আর দ্বিতীয় কোনো মানে হয় না।

কারণ, ৪৪-এর পূর্ববর্তী সংখ্যা ৪৩-এর বর্গ, $৪৩^২ = ১৮৪৯$

১৮৪৯ সালে যদি জয়ন্তবাবুর বয়স হয় ৪৩, তাঁর জন্মসাল দাঁড়াচ্ছে, ১৮৪৯-৪৩ = ১৮০৬

অসম্ভব।]

সংখ্যার ঘাড়ে ডাণ্ডা

পাঁচটা ডাণ্ডা বসিয়ে ২৩-কে যাতা করে দিতে পারো ?

কিংবা একটা সিঁদুরের কৌটা দিয়ে আর চারটে ডাণ্ডা বসিয়ে ৩৬-কে তাড়া করতে পারো ?

[২-এর মাথায় একটা ডাণ্ডাকে শুইয়ে দাও আর তার ডান ধারে দাঁড় করিয়ে দাও আরেকটা ডাণ্ডা। ২-টা তাহলে 'য' হয়ে গেল। এবার 'য'-এর ডান ধারে আবার একটা ডাণ্ডা খাড়া করে বসিয়ে দিলেই—'যা'। একই ভাবে ৩-এর মাথায় ও ডান ধারে···নাঃ, আর বলতে যাওয়া মানে, তোমাদের বোকা ঠাওরানো।]

অবিশ্বাস্য

আমাদের পাড়ার হাবু আজকাল লরি চালায়। সেদিন হঠাৎ হাবুর সঙ্গে দেখা। 'কিরে কেমন আছিস?' জিজ্ঞেস করলাম।

আমাকে দেখেই হাবু দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এই তো—ভালই হল তোকে পেয়ে। তুই তো একটা অঙ্কের বই লিখেছিস শুনেছি। একটা প্রশ্ন করব, উত্তর দে তো' দেখি! তার আগে একটা কথা, মাইল-মিটার কাকে বলে জানিস?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, জানি না।

'মাইল মিটার একটা যন্ত্র। সব গাড়িতেই থাকে। একটা গাড়ি কত মাইল পথ অতিক্রম করেছে এই যন্ত্র তার হিসেব রাখে। ধর্—একটা মাইল মিটারে দেখা যাচ্ছে ৬৫৭৮—এই সংখ্যাটা উঠেছে। তার মানে, গাড়িটা এ অবধি ৬৫৭৮ মাইল চলেছে। গাড়ি এক-এক মাইল এগোবে আর মিটারের সংখ্যাটাও এক-এক করে বাড়তে থাকবে। এবার আমার প্রশ্নের কথাটায় আসি।'

হাবু যা বলল, সেটা সংক্ষেপে অনেকটা এই রকম—পরশু রাত্তিরে ও লরি নিয়ে বেরিয়েছিল। খানিক দূর যাবার পর ওর হঠাৎ চোখ পড়েছিল মাইল-মিটারের ওপর। মাইল-মিটারে তখন ১৫৯৫১ মাইল দেখাচ্ছে। হঠাৎ হাবুর খেয়াল হল যে এই সংখ্যাটাকে উল্টো করে লিখলেও একই থেকে যায়। ভারী অবাক হয়ে গেছল হাবু। ভেবেছিল, মাইলমিটারে এমন বিচিত্র একটা সংখ্যা দেখার সৌভাগ্য বোধ হয় সহজে কারুর হয় না। হাবুও হয়তো জীবনে আর কোনদিন এমন সোজা-উল্টোহীন সংখ্যা আর দেখতে পাবে না। হাবু কিন্তু ঠিক দু'ঘণ্টা বাদে আবার অবাক হল। মাইল মিটারে এবার যে সংখ্যা দেখা দিয়েছে সেটারও সোজা-উল্টোর বালাই নেই।

এখন হাবুর প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিন রাত্তিরে ও ঘণ্টা পিছু কত মাইল বেগে লরি হাঁকিয়েছিল? (পরের পাতায় উত্তর আছে)

[১৫৯৫১-র এর চেয়ে বড় এই ধরনের যে-সংখ্যাগুলো মাইল-মিটারে দেখা দিতে পারে সেগুলো নীচে লিখে দেওয়া হল—

(১) ১৬৯৬১
(২) ১৬৮৬১
(৩) ১৬৭৬১
(৪) ১৬৬৬১
(৫) ১৬৫৬১
(৬) ১৬৪৬১
(৭) ১৬৩৬১
(৮) ১৬২৬১
(৯) ১৬১৬১
(১০) ১৬০৬১

এ ছাড়াও ১৫৯৫১ পাল্টে ২৫৯৫২ হতে পারতো বা ৩৫৯৫৩। কিন্তু তাহলে দু'ঘণ্টায় লরিকে যেতে হত ১০,০০১ মাইল বা ২০,০০২ মাইল। সেটা সম্ভব নয়।

এবার ১ম সম্ভাবনার কথা ধরা যাক। মিটারে ১৬৯৬১ ওঠা মানে লরিটা দু' ঘণ্টায় গেছে = ১৬৯৬১-১৫৯৫১ = ১০১০ মাইল

অসম্ভব।

এই ভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি সম্ভাবনাগুলোকে এক এক করে বিচার করে দেখলে বুঝবে—সবগুলোই অবাস্তব। দু' ঘণ্টায় কোন লরি এত দূর যেতে পারে না। এবার শেষ সম্ভাবনাটা বিচার করা যাক। হাবু যদি মাইল-মিটারে ১৬০৬১ মাইল দেখে থাকে, তাহলে দু' ঘণ্টায় লরি গেছল = ১৬০৬১ – ১৫৯৫১ = ১১০ মাইল

অতএব এক ঘণ্টায় গেছল = ১১০ ÷ ২ = ৫৫ মাইল

ঘণ্টা পিছু ৫৫ মাইল করে লরি ছোটানো আদৌ অসম্ভব নয়। কাজেই—হাবুর লরি সেদিন ঘণ্টা পিছু ৫৫ মাইল করে ছুটেছিল।]

সময় বিভ্রাট

ট্রেনে চড়ে ব্যাণ্ডেলে চলেছি। সঙ্গে আছে আমার বন্ধু রবি। ছশছশ শব্দে উল্টোদিক থেকে লোকাল ট্রেনগুলো আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছে। লোকাল লাইনে এত ট্রেন, তবু কী ভিড়। রবিকে বললাম, 'ঘড়ি মিলিয়ে দেখ্‌তো, ক' মিনিট অন্তর ট্রেনগুলো যাচ্ছে।'

রবি ঘড়ি ধরে বেশ খানিকক্ষণ নজর রাখার পর জানাল, 'পাঁচ মিনিট অন্তর।'

'তাহলে বোঝ্‌। পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে ট্রেন যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় তার মানে বারোটা করে আপ্‌ বা ডাউন ট্রেন স্টেশনে পৌঁছচ্ছে, তবু কী ভিড় স্টেশনে।'

রবি ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর হেসে বলল, 'তুই না আবার অঙ্কের গল্প লিখিস? ছেড়ে দে—ওসব ছেড়ে দে—'

'কেন? ভুল বললাম কোথায়?'

'ভুল বলিসনি। বারোটা করে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছচ্ছে বললি না? পুরো ভুল।' এবার রবি আমাকে ভুল ধরিয়ে দিল। দেখি তোমরা কে-কে রবির মতো আমার ভুল খুঁজে বার করতে পারো।

[আমরা একটা ট্রেনে বসে সময় দেখেছি। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল না, সমান গতিতে এগোচ্ছিল। তার মানে, একটা ট্রেন আমাদের দিকে আসছিল, আর আমরাও একই সঙ্গে, একই গতিতে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এই দু'টো ট্রেনের মধ্যে দেখা হবার আগে আমাদের ট্রেনটাকে পাঁচ মিনিট এগোতে হয়েছে, আবার উল্টো-দিকের ট্রেনটাকেও পাঁচ মিনিট এগোতে হয়েছে, তবে দু'টো ট্রেনের মধ্যে দেখা হয়েছে। তার মানে আপ বা ডাউন লাইনে দশ মিনিট অন্তর ট্রেন চলাচল করছে। একটা লোক যদি কোনো স্টেশানে দাঁড়িয়ে আপ বা ডাউন লাইনের ওপর নজর রাখে, সে দেখবে প্রতি দশ মিনিট অন্তর ট্রেন আসছে বা ট্রেন ছাড়ছে।]

এই না শুনে অগ্নিশর্মা সাধু লাঠি উচিয়ে তেড়ে আসে। 'তবে—রে—'

চা-ওলা উঠে দাঁড়িয়ে। 'দাঁড়ান—আগে আমার কথা শুনুন, তাহলেই বুঝবেন যে আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িনি। আপনি যে মিথ্যে কথা বলেছেন আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।'

এরপর চা-ওলা যা বলল, শুনে সাধুর রাগ জল হয়ে গেল। মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে সাধু আর পালাতে পথ পেল না।

তোমরা বলতো দেখি, চা-ওলা কি করে প্রমাণ করেছিল যে সাধু মিথ্যেবাদী ?

[ধরো, সাধু সকাল আটটায় পাহাড়ের চুড়ো থেকে নীচে নামতে শুরু করেছে আর চা ওলাটাও ঠিক সকাল আটটায় নীচের থেকে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। সাধু যে-গতিতেই নামুক, যেখানে খুশী দাঁড়াক,—চা-ওলা যে গতিতেই উঠুক, যেখানে খুশী দাঁড়াক,—কোথাও না কোথাও দু'জনের মুখোমুখি দেখা হবেই। তার মানে, সিঁড়ির কোন না কোন ধাপে একই সময়ে পা পড়বেই। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ওপরে ওঠা ও নীচে নামার সময়, এই দু'দিনের মধ্যে সিঁড়ির যে-কোন একটা ধাপে, ঠিক একই সময়ে, সাধু পা দিয়েছিল।]

সাদা-সাদা, কালো-কালো, সাদা-কালো

তিনটে দেশলাই বাক্স। একটাতে আছে ছুটো সাদা মার্বেল, একটাতে ছুটো কালো মার্বেল, আর তৃতীয়টাতে একটা সাদা ও একটা কালো। বাক্স তিনটের একটার ওপর লেখা—‘সাদা সাদা।’ আর একটার ওপর লেখা—‘কালো-কালো’। আর শেষ বাক্সটার ওপর লেখা—‘সাদা-কালো’। প্রত্যেকটা লেখাই কিন্তু ভুল। ‘সাদা-সাদা’ বাক্সে ছু’টো সাদা মার্বেল নেই, ‘কালো-কালো’ বাক্সে ছু’টো কালো মার্বেল নেই, আর ‘সাদা-কালো’ বাক্সে একটা সাদা ও একটা কালো মার্বেল নেই।

এরমধ্যে থেকে যে কোন একটা বাক্স খুলে, একটা মাত্র মার্বেল বার করো। এই মার্বেলটার রঙ দেখে তোমরা কি বলে দিতে পারবে, কোন্ বাক্সে কোন্ কোন্ মার্বেল আছে ?

[‘সাদা-কালো’ লেখা বাক্সটা থেকে যে কোন একটা মার্বেল টেনে বার করো। ধরো সাদা মার্বেল বেরল। ‘সাদা-কালো’ বাক্সের মধ্যে একটা মার্বেল যদি সাদা হয়, অন্যটাকেও সাদা হতে হবে। না হলে, ‘সাদা-কালো’ লেখাটা তো ভুল হতে পারে না। বাকী রইল তিনটে কালো আর একটা সাদা মার্বেল। বোঝাই যাচ্ছে সাদা-সাদা বাক্সে রয়েছে ছুটো কালো মার্বেল, আর ‘কালো-কালো’ বাক্সে রয়েছে একটা সাদা ও একটা কালো মার্বেল।

‘সাদা-কালো বাক্স থেকে যদি প্রথমে কালো মার্বেল বেরত, তাহলে কি হত ? এর উত্তর ঠিক আগের মতো করেই বের করতে পারবে। নিজেরা চেষ্টা করো।]

হাঁটা আর গাড়ি-চড়া

এক অফিসারকে আনতে রোজ সকাল ন'টার সময় ড্রাইভার স্টেশনে গাড়ি নিয়ে আসে। সেদিন ঘড়ি দেখতে ভুল করায় ভদ্রলোক পাক্কা এক ঘণ্টা আগে স্টেশনে এসে হাজির হলেন। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কারুরই ভাল লাগার কথা নয়, তাছাড়া তেমন গরমও ছিলনা, ফলে ভদ্রলোক হাঁটতে শুরু করলেন অফিসের দিকে। রাস্তাতেই গাড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাকী রাস্তাটুকু গাড়ি করেই আসতে পারলেন। অফিসে এসে দেখা গেল, রোজ উনি যে সময়ে পৌঁছন, আজ তার দশ মিনিট আগে এসেছেন।

বলতে পার, কতক্ষণ হাঁটার পর ভদ্রলোক গাড়ি দেখতে পান?

[৫৫ মিনিট হাঁটার পর, ৮-৫৫ মিনিটে ভদ্রলোক গাড়িতে ওঠেন। দশ মিনিট আগে গাড়িটা অফিসে ফিরতে পেরেছিল। তার মানে অন্যদিনের তুলনায় গাড়িটা আজ যাতায়াত মিলিয়ে দশ মিনিট সময় বাঁচিয়েছে। অর্থাৎ, রোজ যে সময় স্টেশনে পৌঁছয় তার পাঁচ মিনিট আগেই অফিসের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। গাড়িটা রোজ ন'টার সময় স্টেশনে পৌঁছয়, তাই আজ যখন রাস্তায় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন আটটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট।]